Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

পঞ্চম বর্ষ ■ সংখ্যা ২ - ডিসেম্বর ২০১৫

❖ধর্ম – সমাজ ও বিজ্ঞান❖

❖সম্পাদকীয় ঃ বিশ্বের কোনো ধর্মবাদীরাই পরমত সহিষ্ণু নয়

❖চার্লস ডারউইন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না❖ডিম আগে না মুরগি আগে

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ	বিশ্বের কোন ধর্মবাদীরাই পরমত সহিষ্ণু নয়	৩
মতামত ঃ	"আমরা রোবটের জন্য নয় পুঁজিবাদের জন্য আতঙ্কিত" – স্টিফেন হকিংস	৭
বিশেষ নিবন্ধ ঃ	ধর্ম – সমাজ ও বিজ্ঞান	৮
জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান ঃ	ডিম আগে না মুরগি আগে	২৮
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ঃ	নিউট্রিনো গবেষণায় নবতম সংযোজন – 'ইনো'	৩০
সংবাদ দর্পণ ঃ	দুধে ভেজাল	৩২
কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখে কারা ঃ	◆বাড়ির সামনে নীল জলের বোতল	৩৫
	◆জ্যোতিষবিদ্যা এক সাংঘাতিক ফাঁদ	৩৬
বিজ্ঞানের খবর ঃ		৩৭
	Imagine - John Lennon	৩৯
	ডারউইন ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না	৪০

■প্রচ্ছদের ছবিটি প্রাচীন মিশরীয় সমাজে সূর্যদেবের উপাসনার একটি অঙ্কিত চিত্র■

সম্পাদকীয়

বিশ্বের কোন ধর্মবাদীরাই পরমত সহিষ্ণু নয়

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের উগ্র ইসলামবাদীদের মত এদেশে হিন্দুত্ববাদীরা যুক্তিবাদী নেতা নরেন্দ্র দাভোলকর, শ্রমিক নেতা গোবিন্দ পানেসর, যুক্তিবাদী সাহিত্যিক এম এম কালবুর্গিকে হত্যা করেছে। গোমাংস খাওয়ার ভূয়া অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে গত সেপ্টেম্বর মাসে মহম্মদ ইখলাক নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরিতে মৃত গরুর ছাল ছাড়ানোর অভিযোগে অক্টোবর মাসে দুজন নিম্নবর্ণের মানুষকে পিটিয়ে অধমরা করা হয়েছে। গো-হত্যা করা হয়েছে এই গুজব ছড়িয়ে অক্টোবরেই জম্মু-কাশ্মিরের বাসিন্দা জাহিদা আহমেদকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের সিরসৌর জেলায় অক্টোবরেই গরু পাচারের সন্দেহে এক মুসলমান ধর্মাবলম্বী যুবককে পিটিয়ে মারা হয়েছে এবং তার তিন বন্ধুকে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মণিপুরের শিক্ষক মহম্মদ হাসনাদ আলিকে গরু চুরির অভিযোগে পিটিয়ে মারা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা দেশের প্রতিটি কোণায় প্রায় প্রতিদিন ঘটেই চলেছে। এর পাশাপাশি মুম্বইতে শিবসেনার হুমকীতে পাক গজল শিল্পী গুলাম আলির অনুষ্ঠান বাতিল করা, হরিয়ানার বিজেপি সরকারের ক্রিড়ামন্ত্রীর দ্বারা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বদলে গরুকে 'জাতীয় পশু' করার দাবি তোলা, দুজন ট্রাক চালককে গো মাংস খাওয়ার গুজব ছড়িয়ে জম্মু-কাশ্মিরে প্রহার করার প্রতিবাদ করায় নির্দল বিধায়ক রশিদ ইঞ্জিনিয়ার-এর উপর বিজেপি বিধায়কদের হামলা, প্রাক্তন পাক বিদেশমন্ত্রী এম কাসুরির বই প্রকাশ অনুষ্ঠান আয়োজনের অপরাধে শিবসেনা দ্বারা সুধীন্দ্র কুলকার্নির মুখে কালি লেপন ... একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে পরমত অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তুলেছে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মৌনতাকে এই কর্মকান্ডে সম্মতির লক্ষ্মণ হিসাবে বিবেচনা করছে। তথাকথিত সেকুলারবাদী বুদ্ধিজীবীরা সরকারের কাছে সাংবিধানিক রাজধর্ম প্রতিপালনের আর্জি পেশ করেছেন। হিন্দুত্ববাদীদের অসহিষ্ণু আচরণে এবং প্রধানমন্ত্রীর মৌনিবাবা'র রূপ দেখে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ দ্বারা সরকারি পুরস্কার ও উপাধি প্রত্যর্পণ করা শুরু হওয়ায় দেশজুড়ে ঝড় উঠেছে। এর মাঝে বলিউডের দুই মেগাস্টার শাহরুখ খান এবং আমির খানের অসহিষ্ণুতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ ঝড়কে তুফানে পরিণত করেছে। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানকর্মী সহ প্রায় সমস্ত স্তরের বুদ্ধিজীবীরা এখন দুই পরস্পর বিপরীত শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

এই পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য গত অক্টোবরে দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখোপাধ্যায় ভাইস প্রেসিডেন্ট হামিদ আনসারি লিখিত একটি পুস্তক উদ্বোধন উপলক্ষে তাঁর ভাষণে বলেন "পরমত সহিষ্ণুতার যে ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে।" সম্প্রতি ব্রিটেন সফরকালে ব্রিটিশ সংসদে প্রদত্ত ভাষণে নিমরাজি হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও একই সুরে কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে হিন্দুত্ববাদীরা ও কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান মনস্ক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত রেখেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ঘোষণা করেছে যে দাদরি'র গোমাংস ভক্ষণকারীকে বেদোক্ত অনুশাসন মেনেই হত্যা করা হয়েছে। ভারতবাসী মানেই হিন্দু। গর্বভরে বল আমি হিন্দু। এদেশে থেকে যারা হিন্দুত্বের বিরোধিতা করবে তারা দেশের শত্রু ইত্যাদি ইত্যাদি। পরমত সহিষ্ণুতার ললিতবাণী, যা নানা কাব্য সাহিত্যে প্রচার হয়, দেশাত্মবোধক গানে প্রচার হয় যেমন "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান / বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান" তা নিতান্তই পরিহাস।

কিন্তু বিশ্বের ইতিহাসে কোনো ধর্মবাদীদেরই অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার নজির পাওয়া যায় না। বিপরীতে শ্রমজীবী তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে পরধর্মে অসহিষ্ণুতার নজিরও বিরল। ধর্মবাদীদের উস্কানি ছাড়া সাধারণ মানুষ পরধর্মে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন না। বর্তমান চলমান বিতর্কর প্রেক্ষিতে হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার ২০শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় "ইন্ডিয়া উইল সারভাইভ দিস ক্লাইমেট অব ইনটলারেন্স" শিরোনামে একটি নিবন্ধে সাংবাদিক চানক্য লিখেছেন "মৌর্য অধ্যায় থেকে সুদীর্ঘ ইতিহাস আমি দেখেছি, যার প্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি ঃ এই অসহিষ্ণুতা আগেও ছিল। সম্ভবত পরেও থাকবে।"

প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে এবং অপর ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের হীন প্রতিপন্ন করতে শেখায়। শুধুমাত্র

দাসযুগ বা সামন্তযুগ নয়, আধুনিক পুঁজিবাদী যুগেও বিশ্বের কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ভারতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, দুনিয়ার ধর্মসংক্রান্ত ইতিহাস দেখায় যে তা বিভিন্ন ধর্মবাদীদের এমনকি একই ধর্মের বিভিন্ন ধারা বা গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। ভারতের ইতিহাস বিচার করে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে সুদূর অতীতে এই ভূখন্ড অনার্য এবং আর্যদের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস ছিল। পরবর্তীতে দেখা যায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মবাদীদের মধ্যে সংঘাত। বৌদ্ধ শাসনকালে দেখা যায় একদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মবাদীদের মধ্যে সংঘাত আর অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের দুই ধারা হীনযান ও মহাযানদের মধ্যে সংঘাত। হিন্দু শাসনকালে হিন্দু ধর্মের শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে সংঘাত কিছু কম হয় নি। মুসলমান শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত প্রধান ছিল। এর পাশাপাশি ছিল মুসলমান ও শিখধর্মবাদীদের মধ্যে সংঘাত, মুসলমানদের দুই প্রধান ধারা সুন্নী ও শিয়া ধর্মবাদীদের মধ্যে সংঘাত। ব্রিটিশ শাসনকাল ছিল খ্রিস্টান-হিন্দু, খ্রিস্টান-মুসলমান এবং হিন্দু-মুসলমান ধর্মবাদীদের মধ্যকার সংঘাতের ইতিহাস।

সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় মুসলমান ধর্মবাদীদের শিয়া ও সুন্নীদের সংঘাত আজ সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে। এর পাশাপাশি রয়েছে ইহুদি-মুসলমান, মুসলমান-খ্রিস্টান, ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মবাদীদের সংঘাত। পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সংঘাত আজও জারি আছে। সমগ্র ইউরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে চলছে খ্রিস্টান-মুসলমান দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে খ্রিস্টান-ইহুদি সংঘাত এবং ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুশো বছরের খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্মবাদীদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান। সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী, মানবিক এবং পরমত সহিষ্ণু হতে শেখায় এমন নীতিকথা সর্বৈব মিথ্যা।

ব্রিটিশ শাসনকালের পরবর্তী ভারতেও সহিষ্ণুতার কোনো লক্ষ্মণ দেখা যায় নি। অখন্ড ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নে বিভক্ত হয়েছিল হিন্দু ও ইসলাম মতবাদী দুটি রাজনৈতিক দলের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্য দিয়ে। নয়া ভারতে শাসকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মধর্মবাদী (খ্রিস্ট ধর্মের আদলে তৈরি হিন্দু ধর্ম) শাসকদের আধিপত্য ছিল। শাসকশ্রেণীর সংখ্যালঘু মুসলমান, খ্রিস্টান, দলিত (মোহনদাস গাঁধী যাদের হরিজন বলতেন) ও অন্যান্যরা ছিল কৃপার পাত্র। পাকিস্তানে শাসকশ্রেণীর সুন্নী মুসলমানরা হল আধিপত্যকারী। শিয়া মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘু ধর্মবাদীরা হল কৃপার পাত্র। একথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে পুঁজির শোষণাধীন রাষ্ট্রে দাসযুগ বা সামন্তযুগের মত সব সময় খোলাখুলি ধর্মীয় অনুশাসন চালানো যায় না। পুঁজিবাদী যুগে প্রত্যেকটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র গণতন্ত্রের মোড়কে পুঁজির অনুশাসন চালায় সেই অনুসারী আইন কানুন লাগু করে। ধর্মীয় অনুশাসনের আফিমকে পুঁজিপতিশ্রেণী তাই আজও এক বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। পুঁজিবাদী যুগে প্রতিটি রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণীর সংখ্যাগুরু অংশ যে ধর্মমতে বিশ্বাসী, রাষ্ট্র সেই ধর্মকে সর্বাধিক উর্ধ্বে তুলে ধরে এবং তার প্রচার প্রসারে সহায়ক হয়। অন্য ধর্মাবলম্বী শাসকশ্রেণী ও ধর্মবাদীদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে কৃপার পাত্র করে রাখে। প্রয়োজন পড়লে শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্বে তারা সংখ্যালঘু তাস ব্যবহার করে। আর সমগ্র শোষিত জনতাকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষার দ্বন্দ্বে বিভক্ত করে রাখে, ধর্মীয় অন্ধত্বের কারাগারে আবদ্ধ রাখে।

এই কারণে নয়া ভারতরাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে লাগু হওয়া নয়া ভারতের সংবিধানে **'ধর্মনিরপেক্ষ'** বা **'সেকুলার'** শব্দটি ছিল না, এই সংবিধানে "ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার"কে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শিক্ষা-স্বাস্থ্য বা কাজের অধিকারকে নয়। জরুরি অবস্থার সময় ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনী এনে 'সেকুলার' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সোসালিস্ট' বা 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটিকে সংবিধানের প্রস্তাবনা বা ভূমিকাতে যুক্ত করা হয়েছে। মূল সংবিধানে নয়। এই কারণে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'র মৌলিক অধিকারের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ বা সমাজতান্ত্রিক শব্দদুটির কোন সামঞ্জস্য নাই। রাষ্ট্রের নীতি বিচার করলে বা রাষ্ট্রনেতাদের আচরণের মধ্যেও এই সামঞ্জস্য কোনদিন দেখা যায় নি। কারণ **ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আচরণ মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ভারতরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আচরণে বাধ্য নয়।** গত ২৬শে নভেম্বর ২০১৫ অসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে সংসদে আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন "ইংরেজি 'সেকুলার' শব্দটির হিন্দি করা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষ'। এই ব্যবহার সঠিক নয়। হিন্দিতে হওয়া উচিত 'পন্থনিরপেক্ষ'। তাছাড়া মূল সংবিধানে 'সমাজতন্ত্র' ও 'সেকুলার' শব্দদুটি প্রস্তাবনায় ছিল না। ৪২তম সংবিধান সংশোধনে এই পরিবর্তন করা হয়। আম্বেদকরও প্রস্তাবনায় শব্দ দুটি রাখা প্রয়োজন মনে করেন নি।"

সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা বিতর্কে যে বুদ্ধিজীবীরা এবং কংগ্রেস-

বাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি সংবিধানের দোহাই দিয়ে সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিপালনের জন্য বলছেন তারা কি সংবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ? আদৌ নয়, তারা সব জেনেশুনেই শ্রেণীরাষ্ট্রের চরিত্রকে আড়াল করতে মিথ্যার সাথে লড়ছেন। সুতরাং এই লড়াই অসাড়, ছদ্মবিরোধিতা মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ গোহত্যা নিষিদ্ধকরণ প্রশ্নেও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবী এবং বিজেপি সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করছেন না। **ভারতের সংবিধান হিন্দুত্ববাদীদের গোরক্ষা কর্মসূচীকে স্বীকৃতি দিয়ে ৪৮নং ধারাতে গরু জাতীয় (গাভী-বাছুর, বলদ-ষাঁড় ও মহিষ) পশু হত্যা নিষিদ্ধ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলিকে।** সংবিধানের এই ধারা অনুসারেই দেশের অধিকাংশ রাজ্য গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছে। এর চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ

১) গাভী ও বাছুর / ষাঁড় ও মহিষ হত্যা নিষিদ্ধ ঃ জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরাখন্ড, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী, ছত্তিশগড়। [দিল্লিতে পশুগুলি ১০ বছরের বেশি হলে নিষিদ্ধ নয়। জম্মু-কাশ্মিরে রণবির কোড ১৯৩২ অনুসারে নিষিদ্ধ।]

২) গাভী ও বাছুর, বলদ/ষাঁড় হত্যা নিষিদ্ধ ঃ গুজরাত

৩) গাভী ও বাছুর ও মহিষ হত্যা নিষিদ্ধ ঃ মধ্যপ্রদেশ

৪) গাভী ও বাছুর হত্যা নিষিদ্ধ ঃ মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, মণিপুর। [মণিপুরে ১৯০৬-এর দরবার সিদ্ধান্ত অনুসারে নিষিদ্ধ।]

৫) গাভী ও বাছুর, বলদ/ষাঁড় ও মহিষ হত্যা নিষিদ্ধ নয় ঃ পশ্চিমবঙ্গ, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, কেরালা।

(দেশের কোনও রাজ্যই গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করেনি। তথ্যসূত্র ঃ কেন্দ্রের পশু ও পশুপালন বিভাগ এবং হিন্দুস্তান টাইমস)

এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য খবর প্রকাশিত হয়েছে ইংরাজি দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং এশিয়ান এজ-এর ১১ই অক্টোবর ২০১৫ তারিখে। উক্ত খবর অনুসারে হালাল করা বা মুসলিম প্রথায় জবাই করা মাংস রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত এখন শীর্ষস্থানে। এই মাংস রপ্তানিকারক কোম্পানিগুলির মধ্যে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি'র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নামও আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজেপি নেতা মনগীত সোম (যিনি দাদরি হত্যাকান্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন) আল দুয়া ফুড প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ধারক এবং ডিরেক্টর বোর্ডেও ছিলেন। এই কোম্পানি গোমাংস সহ সমস্ত ধরনের পশুর মাংস রপ্তানি করে। এই তথ্য প্রমাণ করে ধর্মবাদী শাসকশ্রেণীর ধর্মবাদ জনগণকে বিভক্ত করে শোষণ করার নীতি ভিন্ন কিছু নয়। পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে এদের কোনও জাত নেই।

তৃতীয়তঃ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবী এবং মোদি সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অসহিষ্ণুতার সমস্ত দায় বিজেপি সরকারের উপর ন্যস্ত করেছে। এই দাবি এই বিরোধী দলগুলির সংসদীয় উদ্দেশ্যই প্রমাণ করেছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ভূমিকা নয়। কারণ ভারতে হিন্দুত্ববাদের প্রচার-প্রসার এবং অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ কংগ্রেসী শাসনকাল থেকেই হয়ে আসছে। রাজ্যে রাজ্যে ডান-বাম সব দলই এই ভূমিকা পালন করে আসছে সুদূর অতীত থেকে। বাক্ স্বাধীনতার প্রতি আক্রমণকে আইনসিদ্ধ করেছে কংগ্রেসী সরকার। ভিন্ন মত প্রকাশ করার অপরাধে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার এবং রাজ্যের নানা রঙের সরকার। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, গুজরাত, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের কোণে কোণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে প্রায় প্রতিটি সরকারের আমলে। বাবরি মসজিদকে রামমূর্তির পূজার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল রাজীব গাঁধীর সরকারের আমলে। ঐ মসজিদের ভগ্নাবশেষের উপর রাম মন্দির স্থাপনা হয়েছিল নরসিংহ রাও সরকারের আমলে। সুতরাং সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতার বিতর্কের পিছনে নির্বাচনী লড়াইটাই মুখ্য। সংখ্যালঘু ধর্মবাদীদের কৃপার পাত্র করে রাখতে শাহবানু মামলায় কংগ্রেসী সরকারের ভূমিকা, পশ্চিমবঙ্গে মৌলবীদের তৃণমূলীদের সরকারি ভাতা দান কি ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়?

এতো গেল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার একটা দিক। শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকে অন্য প্রধান দিকটা হলো যুক্তিবাদীদের হত্যা, বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল জনতার কণ্ঠরোধ। দাদরিতে মহম্মদ ইখলাক হত্যার পর মিডিয়ার কাছে এই বিষয়টা চাপা পড়ে গেছে। হিন্দু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি।

যুক্তিবাদীদের হত্যা করার পিছনে যে উৎস তা নিহিত আছে শাসকশ্রেণীর শাসন ব্যবস্থা, কুসংস্কারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস অটুট রাখার মধ্যে। ধর্মমত নির্বিশেষে শাসকশ্রেণী অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। ইসলাম বা অন্যান্য ধর্মের উগ্রবাদীদের সাথে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের এ বিষয় কোন পার্থক্য নাই। প্রকাশ্যে ধর্মবাদের এবং ধর্মের প্রবক্তাদের

সমালোচনা বা বিরোধিতা যাঁরা করবেন তারা তাদের হত্যা করে। এবছরই বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থীরো ৫ জন যুক্তিবাদীকে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের চোখে কন্নড়ি সাহিত্যিক তথা যুক্তিবাদী এবং হাম্পি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এম এম কালবুর্গির অপরাধ ছিল তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ রচনায় ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। তিনি যে 'বীরশৈব লিঙ্গায়েত' সম্প্রদায়ভুক্ত পিতা-মাতার সন্তান সেই লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের আচার্য চেন্নাবাসব-এর জন্ম বিষয়ক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখেছিলেন যে লিঙ্গায়েতরা হিন্দু ছিল না। এছাড়া কুসংস্কার বিরোধী এক সেমিনারে তিনি হিন্দুত্ববাদীদের হাতে অতীতে নিহত ইউ আর অনন্তমূর্তির একটি উক্তিকে সমর্থন করেছিলেন। অনন্তমূর্তি বলেছিলেন – তিনি একদিন না জেনে লোকেরা পূজা করে এমন একটি পাথরের মূর্তিতে প্রস্রাব করে ফেলেছিলেন। তাতে তার কোনও ক্ষতি হয় নি। এর অর্থ ভগবান বলে কিছু নেই। এই উক্তি প্রকাশ্যে করার কারণে অনন্তমূর্তিকে হিন্দুত্ববাধীরা হত্যা করেছিল। কালবুর্গিকে হত্যা করার পর বজরঙ দলের বাঁতওয়াল শাখার সহকারী আহ্বায়ক ভূবিত শেঠি ট্যুইট বার্তায় বলেছিলেন "ইউ আর অনন্তমূর্তির পর নিকেশ হলো এম এম কালবুর্গি। হিন্দুত্ব নিয়ে ঠাট্টা করো আর কুকুরের মতো মরো।"

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, যে যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীরা ও নাস্তিকরা প্রকাশ্যে ধর্মের নিন্দাবাদ করেন ও ধর্মের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে প্রচার করেন তাঁরা কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি ও তাদের দ্বারা প্রদত্ত বাক্ স্বাধীনতার প্রতি প্রবলভাবে আস্থাশীল। তাঁরা ভুলে যান যে এই গণতন্ত্র হলো ধর্মবাদীদের গণতন্ত্র। তাই তারা সহজে ধর্মবাদীদের শিকারে পরিণত হন।

যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের আলোকে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য লিখিত বইপত্র রাষ্ট্র দ্বারা নিষিদ্ধ করার অনেক উদাহরণ আছে। মহারাষ্ট্র সরকার অতি সম্প্রতি পুলিশকে সার্কুলার দিয়ে নির্দেশ দিয়েছে যে কোনও ব্যক্তি যদি সরকারের কোনও মন্ত্রীর সমালোচনা করে যা রাষ্ট্রকেও আঘাত করে তবে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তার করতে হবে। রাষ্ট্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনকারী পুস্তক ও ভাষণ নিষিদ্ধ করার আইন আছে রাষ্ট্রের। প্রয়োজন মনে করলে তার প্রয়োগও দেখা যায়। বাক্-স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে উগ্র ইসলামপন্থীদের আব্দার মেনে তসলিমা নাসরিনকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। তিনি এখনও গৃহবন্দি আছেন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনায় ও আশ্রয়ে।

অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর পাঠ্যপুস্তকে অপবিজ্ঞান, কুসংস্কার ইত্যাদি স্থান পাচ্ছে। জ্যোতিষচর্চাকে বিজ্ঞান বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারগুলিই প্রাচীন মুনিঋষিরা হাজার হাজার বছর আগেই সম্পন্ন করেছিল অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার পৃথক মূল্য নাই সরকার এই বার্তাই দিয়েছে বিগত বিজ্ঞান কংগ্রেসে। এই অভিযোগগুলি সঠিক। আইএস-এর মত মুসলীম ধর্মবাদীরা মধ্যপ্রাচ্যে যা করছে তার সাথে ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের আচরণের পার্থক্য নাই। কিন্তু প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত ভাষা শেখার পাঠ্য পুস্তকগুলিতে ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস ভিত্তিক রচনা কি অতীত দিনে ছিল না? ব্রিটিশ জমানায় বা সকল অ-বিজেপি সরকারের আমলেই পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক রচনা ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদের কল্পকাহিনী ভিত্তিক রচনা আগেও যেমন ছিল এখনও তেমন আছে। এখন তার সাথে নতুন নতুন কল্পকাহিনী যুক্ত করা হচ্ছে মাত্র।

সুতরাং সর্বোতভাবে বিচার করলে বলা যায় বিজেপি এবং সংঘ পরিবার হিন্দুত্ববাধী আর বিজেপি বিরোধী কংগ্রেস-বাম-তৃণমূল বা অন্যরা সেকুলার একথা সর্বৈব মিথ্যা।

বস্তুত ভারত সহ সমগ্র বিশ্বই এখন পুঁজিবাদ দ্বারা সৃষ্ট চরম আর্থিক সংকটে ডুবে আছে। এর থেকে পরিত্রাণের কোন পথ মালিকশ্রেণীর নেই। তাই পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী উগ্র ধর্মবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শ্রমজীবী জনতার উপর তার সমস্ত সংকটের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র বলছে যে তাদের এই প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। এই চেষ্টা বৃথা চেষ্টার নামান্তর। পুঁজিবাদী শোষণের বোঝা যতই বাড়ছে ততই বাড়ছে শোষণমূলক ব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট তার জাজ্বল্য প্রমাণ। সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষা মিথ্যা হতে পারে না। দেশের মাটিতেও শোষণ ব্যবস্থা বিরোধী সংগ্রামের ভ্রূণ দেখা দিচ্ছে। এই ভ্রূণগুলি যাতে বিকশিত না হতে পারে তার জন্য শাসকশ্রেণী ধর্মের নামে, জাতের নামে, ভাষার নামে মানুষকে বিভাজিত করে রাখছে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তথা ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে।

তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে ইতিহাস দেখায় যে মানব সমাজ দাসযুগ থেকে বর্তমান একচেটিয়া পুঁজিবাদী যুগ পর্যন্ত সকল সময় ধর্মের ভিত্তিতে নয়, অর্থনৈতিক কর্মের

ভিত্তিতে বিভাজিত। উৎপাদনের উপায় উপকরণের মালিকশ্রেণী এবং উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবী শ্রেণীতেই মানব সমাজ বিভক্ত। ধর্ম-বর্ণ-জাতের বিভেদ উপেক্ষা করে শ্রমজীবী জনতা পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবেই। শোষিত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই পুঁজিবাদী শোষণকে উচ্ছেদ করতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। প্রতিটি বিজ্ঞান মনস্ক এবং সমাজ প্রগতিকামী মানুষের উচিত এই সংগ্রামে সামিল হওয়া। ■

"মজহব নেহি শিখাতা আপসমে বৈর রাখনা' (ধর্ম নিজেদের মধ্যে শত্রুতার শিক্ষা দেয় না) এই নির্জলা মিথ্যার কি কোন সীমা আছে? যদি ধর্ম শত্রুতা না শিখাইবে তাহা হইলে আজ পর্যন্ত টিকি এবং দাড়ির লড়াইয়ে আমাদের দেশ উত্তক্ত কেন? ... কে গো-ভক্ষণকারীদের সহিত গোময় ভক্ষণকারীদের বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে? প্রকৃত কথা এই যে ধর্ম নিজেদের মধ্যে লড়াই করিতে শিখায়। ভাইকে ভাইয়ের রক্ত পান করিতে প্ররোচনা দেয়। ভারতবাসীদের ঐক্য ধর্মের মিলনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না, হইবে ধর্মের ভস্মাবশেষের উপর। কাককে ধুইয়া রাজহংস করা সম্ভব নয়। ধর্মের রোগ খুবই স্বাভাবিক। তবে মৃত্যু ব্যতীত উহার কোন চিকিৎসা নাই।" –রাহুল সাংকৃত্যায়ন

মতামত

"আমরা রোবটের জন্য নয় পুঁজিবাদের জন্য আতঙ্কিত"

– স্টিফেন হকিন্স

বিশ্ব বিখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিন্স সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শুধুমাত্র বেরোজগারী বৃদ্ধি নয়, হতে পারে মানব অধিকারের সমাপ্তি। বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধি সম্পন্ন রোবট ব্যবহারের বিরোধিতা তিনি করেন নি, তিনি বিরোধিতা করেছেন পুঁজিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার এবং ব্যবস্থার অধিকাংশ পেশাদারের।

হকিংস বলেছেন যে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধিতে কর্মচ্যুতি বাড়বে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবে, পাশাপাশি যন্ত্রের মালিকদের সম্পদের ভান্ডার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হকিংসকে কতগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় –

১) আপনি কি ভাবছেন – প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির জন্য বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে?

২) আপনি কি পূর্বাভাষ দিচ্ছেন যে পৃথিবীতে মানুষ কম কাজ করবে যেহেতু বেশিরভাগ কাজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দ্বারা হচ্ছে? আপনি কি ভাবেন যে জনগণ সব সময় কাজ খুঁজবে অথবা প্রচুর কাজ তৈরী করবে সম্পন্ন করার জন্য?

হকিংস এগুলির জবাবে বলেন যদি আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই যন্ত্র উৎপাদন করে, তবে এর ফলাফল নির্ভর করবে কিরূপে তা বন্টিত হবে তার উপর। যদি মেশিনে উৎপাদিত পণ্য সকলের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টিত হয় – তবে প্রত্যেকেই বিলাস বহুল অবসর জীবন উপভোগ করবে। আর যদি মেশিনের মালিকরা উৎপন্ন সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করে – তবে বেশিরভাগ মানুষ দুর্দশা পূর্ণ দারিদ্রের চরম সীমায় পৌঁছাবে। যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে দ্বিতীয়টির প্রবণতাই প্রধান (বেশি) এবং তা প্রযুক্তি পরিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত ঘটছে। পুঁজিপতিদের পুঁজি পুঞ্জিভূত করার সীমাহীন আকঙ্ক্ষা মানুষের উপর বছরের পর বছর ধরে মিথ্যা এবং ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি, প্রযুক্তিকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রধান লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন কর্মচ্যুতি ঘটানো।

এই সতর্কতাপূর্ণ অবস্থাকে আমরা যদি গুরুত্ব না দিই, তবে কর্পোরেটদের অধীনস্ত আমাদের অদূর ভবিষ্যতে, "কিংকর্তব্য বিমূঢ়" পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। যদি আমরা এই ব্যক্তিদের ছাড় দিই – যারা আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কেনা-বেচা করে এবং সম্পদ সৃষ্টিকারী স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণকর্তা – তবে আমাদের ধূসর বাস্তবের সম্মুখীন হতেই হবে। ■

বিশেষ নিবন্ধ

ধর্ম – সমাজ ও বিজ্ঞান

প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী মিশরীয়রা পশু বা পাখির মাথাওয়ালা মানব মূর্তীরূপে দেবতাদের কল্পনা করত

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে, **হোমো হ্যাবিলিস** থেকে **হোমো সেপিয়ান সেপিয়ানে** বিবর্তনের পথে মানুষ হয়ে ওঠে সমাজবদ্ধ জীব। ক্রমে মানব জীবন প্রকৃতি নির্ভর অপেক্ষা সমাজ নির্ভর হয়ে পড়ে। সামাজিক শ্রম, সামাজিক অভিজ্ঞতা – প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের পথে বিজ্ঞানের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। যেমন প্লবতার সূত্র আবিষ্কারের বহু পূর্বেই নৌকা তৈরী ও ব্যবহার শুরু হয়েছিল। লিভারের যান্ত্রিক সুবিধার গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারের বহু পূর্বেই অক্ষ ও দন্ডের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগেই একদিকে সীমিত উপায়ের মধ্যেই সমাজবদ্ধভাবে বাঁচার রীতিনীতি নির্ধারণ করা, অন্য দিকে প্রাকৃতিক ঘটনার নিয়ম আজানা থাকায় ভয়ের জন্ম এবং তা সমাধানের জন্য মানব মস্তিষ্কে কাল্পনিক চিন্তার উদ্ভব হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

আনুমানিক ৬০ হাজার বছরের প্রাগৈতিহাসিক মানব সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। এ বিষয়ে যারা গবেষণা করেছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন সুইজারল্যান্ডের বাখোফেন, স্কটল্যান্ডের ম্যাক লেনান এবং মার্কিন নৃকুলবিদ ও নৃতত্ত্ববিদ লুই হেনরী মর্গান। এদের গবেষণালব্ধ ফল থেকেই আমরা প্রাগৈতিহাসিক মানব সমাজ সম্পর্কে একটা ধারণা পাই। আগামী দিনের গবেষণা এই জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে, নৃতত্ত্ববিদ এবং নৃকুল বিদদের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শুরুতে মানুষ তার আদি বাসভূমিতে বণ্য প্রাণীদের মতই জীবন ধারণ করত এবং সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। পরে বাঁচার তাগিদে খাদ্যের অন্বেষণে নদীর গতিপথ এবং সমুদ্রের উপকূল ধরে ছড়িয়ে পড়ে। খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে এবং আন্তঃপ্রজাতি (inter species) সংগ্রামে হাতিয়ারের ব্যবহার এবং ক্রমাগত সেই হাতিয়ারের উন্নতি সাধন, পশুপালন ও কৃষির আবিষ্কার

করে। কৃষির আবিষ্কারই আদিম মানুষের যাযাবর জীবনে ছেদ টেনে দেয়। স্থায়ী বসতি গড়ে উঠতে থাকে মূলত নদী উপত্যকা এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে। মর্গান দেখিয়েছেন আমেরিকার ইরকোয়ান গোত্রের বিভিন্ন শাখাগুলি বিভিন্ন পশুর নামে চিহ্নিত ছিল। আদিম মানুষের এক একটি গোষ্ঠী এক একটি প্রাণী বা বৃক্ষকে **টোটেম** বলে স্বীকৃতি দিত। টোটেম স্বীকৃত জীবটিকে ঐ গোষ্ঠীর মানুষ ভক্ষণ করবে না। তার বৃদ্ধি কামনা করবে। এই নিষেধটি হলো ঐ গোষ্ঠীর **'টাবু'**। প্রতিটি গোষ্ঠীর টোটেম পৃথক পৃথক ছিল। 'টাবু' বিধি নিষেধের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনাকে সামাজিকভাবে হ্রাস করা হয়েছিল। ধর্মের আভিধানিক অর্থ, 'সমাজের হিতকর বিধি'র ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভবত এভাবেই শুরু হয়েছিল। এই যুগে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে টিঁকে থাকতেই গড়ে উঠেছিল গোষ্ঠীবদ্ধ মানব সমাজ। এই সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা না থাকায় সমাজে কোন শ্রেনীভেদ ছিল না। এই আদিম সাম্যতন্ত্রী সমাজে পিতৃত্বের নিশ্চয়তা না থাকায় – তা ছিল **মাতৃতান্ত্রিক**। শুরুতে মাতৃরক্ত সম্পর্কিত মানুষদের নিয়ে এক একটি ক্ল্যান বা গোত্র গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী প্রজন্মের জনয়িত্রী হওয়ার কারণে সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। সকলে মিলে খাদ্য আহরণ করত, সকলে মিলে তা আহার করত। ধাতুর আবিষ্কার ও ধাতব জিনিস তৈরি এবং সূতা ও কাপড় তৈরির সমাজে ব্যক্তিগত শ্রম দ্বারা উৎপাদন পদ্ধতির সূচনা হয়। কামার ও তাঁতীরা ব্যক্তিগত শ্রম দ্বারা উৎপাদন করত। ক্রমে ক্রমে পশুপালন ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি থেকে পৃথক হয়ে যায়। সমাজে বিরাট আকারে শ্রম বিভাজন দেখা দেয়। পশুধন ও কৃষিজ ফসল উদ্বৃত্ত হওয়ার ফলেই যা সম্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের বিনিময় শুরু হয়। শ্রমের এইরূপ সামাজিক বিভাজন ও উদ্বৃত্ত জিনিসের বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ঘরে বাইরে পুরুষের আধিপত্য সৃষ্টি হয় এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজের স্থানে**পিতৃতান্ত্রিক** সমাজের উৎপত্তি ঘটে। সম্ভবত কৃষিকাজের বিকাশের পর থেকে পিতৃতান্ত্রিক গোত্রীয় পরিবারের উদ্ভব হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অভিজ্ঞতাকে নির্ভর করে ঘর-বাড়ি ও পোশাক বানানো ও ব্যবহার শুরু হলেও প্রকৃতির নিয়ম তখনও অজানাই ছিল। সে যুগে মানব মস্তিষ্ক ও হাতিয়ার যে মাত্রায় উন্নত হয়েছিল তা প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আকাশটা হঠাৎ হয়ে গেল কালো, দপ্ করে নিভে গেল দিনের আলো, ঝড়ের মরমর শব্দে ভেঙ্গে পড়ল গাছ, বিদ্যুতের ঝলকানি, বজ্রপাতের কড়্ কড়্ শব্দ, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে উদভ্রান্ত, দাবানলের দাপটে আতঙ্ক, তুষারপাত ও প্লাবনে অসহায় ছিল আদিম মানুষ। জীবন-মৃত্যু ছিল বিস্ময়কর, মহিলাদের যৌন জীবন (ঋতুমতী হওয়া, গর্ভে সন্তান ধারণ ও প্রসব ইত্যাদি) ছিল মানুষের কাছে রহস্যময়। এই সকল রহস্যময় – অসমাধিত ঘটনার কাল্পনিক সমাধান সৃষ্টি করল অলৌকিক শক্তির ধারণা। প্রকৃতির জ্ঞান উন্মেষের পথে বাধা ছিল তাদের মনে গোষ্ঠীপতি বা অগ্রণীর দ্বারা প্রথিত এই অলৌকিক ধারণা যে **মহাকাশে দৃশ্যমান জগত (স্বর্গলোক) মানুষের আদি বাসস্থান। এই অলৌকিক শক্তিই নিয়ন্তা এবং সর্বশক্তিমান।** সুতরাং ঐ শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা কর্তব্য। তাদের ধারণা ছিল প্রাকৃতিক রহস্য ও দুর্যোগের কারণ হলো নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির দেবতার ক্রিয়াকলাপ ও রুষ্ঠ হওয়ার ফল। দেশে দেশে গড়ে উঠল পৃথক পৃথক প্রাকৃতিক শক্তির পৃথক পৃথক দেব-দেবীর মূর্তি। কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দেশের দেব-দেবীর মুখশ্রী ও দেহের গঠন কাঠামো নিজ নিজ দেশের নাগরিকের অনুরূপ। এই আঞ্চলিক কল্পনাই – বস্তু থেকে চিন্তার উৎপত্তির আদি প্রমাণ। দেব-দেবীদের তুষ্ট করার জন্য তাদের কল্পিত মূর্তির সামনে প্রার্থনা – পূজা – আরাধনা শুরু হয়। তথাকথিত অলৌকিক শক্তিকে (দেবদেবীকে) তুষ্ট করে স্বার্থ সিদ্ধ করার উপায় হিসাবে তথাকথিত আধ্যাত্যিক সিদ্ধ পুরুষের মন্ত্রশক্তি রূপে **ইন্দ্রজাল** বা **ম্যাজিকের** আবির্ভাব হয়। যাদু বিদ্যা একটি প্রাচীন পদ্ধতি যা ব্যবহার করা হয়েছে অলৌকিক শক্তির প্রতি আস্থা অর্জনের জন্য। যারা অতি আশ্চর্যজনক কর্মকান্ড ঘটাতে পারে। যা কেবল তারাই পারে। কারণ তা ঘটছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। ফ্রান্সের গুহা বিজ্ঞানী এবেৎ হেনরী ব্রুয়েল আদিম মানুষের ধর্ম ও আলেকজান্ডার মারকোশ আদিম মানুষের যাদু বিদ্যা সম্পর্কে গুহাচিত্র পরীক্ষা করে এবং বর্তমান উপজাতিগুলির লোকধর্ম ও যাদু অনুশীলন পদ্ধতির সঙ্গে আদিম পদ্ধতির অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন। বর্তমানে নানা দেশের নানা উপজাতির মধ্যে নানা ধরনের ধর্মীয় আচরণ ও যাদু অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত বর্তমান উপজাতি সমাজগুলি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। বলা যেতে পারে এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব সভ্যতার/সমাজের "জীবন্ত জীবাশ্ম"। আদিম যুগে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন দেশের মানবজাতির মধ্যে ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত করে। সমাজের রীতি নীতি পরিচালিত হতে থাকে ঋষি, মুনিদের প্রদত্ত ধর্মীয় বিধানে।

জীবনধারণে, কৃষি উৎপাদনে প্রকৃতির অবদান – জমি, সূর্যালোক, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির অপরিহার্যতা থেকে ভূমি, সূর্য, আগুন ও বৃষ্টির দেবতার পূজা সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। আদিম গোষ্ঠী ধর্ম ছিল প্রধানত স্থানিক।

বন্যাবস্থা থেকে তথাকথিত সভ্য সমাজে বিবর্তনের পর্যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগোষ্ঠীগুলি ভেঙ্গে নতুন নতুন জনগোষ্ঠী বা উপজনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। জোড়বাধা পরিবার থেকে এক পতি-পত্নি পরিবারের উদ্ভব হয়। অরণ্য ও জমির অধিকার নিয়ে জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। শ্রমের হাতিয়ারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবই সমাজে শ্রমবিভাজন দেখা দেয়। পুরুষের কাজ হয় খাদ্য জোগাড় ও যুদ্ধ করা। নারীর কাজ গৃহস্থালী দেখা, খাদ্য ও পোশাক তৈরি। এই বিভাগ থেকে সম্পদের মালিকানাও বিভক্ত হয়। পশুধন, কৃষিজ ফলস, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ বন্দি দাস ইত্যাদির মালিকানা পুরুষের। গৃহস্থালী জিনিস ও তৈজসপত্রের মালিকানা নারীর। সমবেতভাবে তৈরি ও ব্যবহৃত সম্পদের – বাড়ি, বাগান, নৌকা সাধারণ মালিকানা ছিল।

আত্মরক্ষার হাতিয়ার যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভ্রূণ সৃষ্টি করেছিল তেমনি হস্তশিল্প ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হবার ফলে ব্যক্তিগত উৎপাদন প্রাধান্য পেতে থাকে। ব্যক্তিগত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত শ্রমশক্তির চাহিদা পূরণে যুদ্ধ বন্দিদের আর মেরে না ফেলে দাসে পরিণত করা শুরু হয়। সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে – শাসক ও শোষিত তথা মালিক ও দাস। গড়ে ওঠে রাষ্ট্র।

পৌরাণিক যুগে দেবতাগণ ছিলেন ক্ষমতাশালী। কিন্তু এদের ক্ষমতা এক একটা বিশেষ কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক দেবতা ছিলেন গোষ্ঠী দেবতা। ফলে নির্দিষ্ট দেবতার উপাসকরা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। কেউ অগ্নির উপাসক, কেউ চন্দ্রের উপাসক, কেউ আবার সূর্যের উপাসক। পরবর্তীকালে এই সব উপাসকরা উক্ত দেবতাদের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চন্দ্র বা সূর্য বংশীয় রাজাদের কথা জানা যায়। যেমন, ভারত, আমেরিকার পেরু, সুমেরু সহ অনেক দেশের ইতিহাসে সূর্যবংশীয় রাজার উল্লেখ আছে। আজ থেকে ১০০০ বছর আগে, ইরানে ইসলাম আগমনের ফলে সমুদ্র পেরিয়ে যে শরণার্থীরা ভারতের গুজরাটে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা ছিলেন জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত অগ্নির উপাসক – এদের বংশধরদের আমরা পার্শি বলি। অসংখ্য দেবতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে মানব মস্তিষ্কে উদিত হয় একজন সর্বশক্তিমান দেবতার। কারণ একই সঙ্গে দুইজন সর্বশক্তিমান হতে পারে না। কিন্তু দেবতারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন তারা কালে কালে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই। তাই চাই অবিনাশী দেবতা। এইরূপ দেবতা হতে গেলে তাকে উৎপত্তি শূন্য হতে হবে। কারণ যার উৎপত্তি আছে তারই বিনাশ আছে। যিনি অনাদি-অসীম তিনিই হবেন অক্ষয়-অমর। অনাদি ও অসীম একজনই হতে পারেন। অবশেষে মানব মস্তিষ্কে উদিত হলো **একেশ্বরবাদ**। দেবতাদের মধ্যে যিনি সর্বশক্তিমান – তিনি অবশ্যই অসীম – অনন্ত – তার কোন আকার থাকতে পারে না। তিনি নিরাকার। ঈশ্বর সাকার থেকে নিরাকার হতে বহু সময় লেগেছে। হিন্দু দর্শন তথা হিন্দু পুরাণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় ব্রহ্মা কোথাও সাকার, আবার কোথাও নিরাকার। বৌদ্ধ ধর্মে হীনযানে মূর্তি পূজা ছিল না, মহাযানে মূর্তিপূজা শুরু হয়। জৈনদের মধ্যে শ্বেতাম্বরদের তেরাপন্থীরা ও দিগম্বরদের মধ্যে সামাইয়ারা মূর্তি পূজা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে। খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর বিশ্বের প্রায় সর্বত্র একেশ্বরবাদ ও নিরাকার ঈশ্বরবাদ প্রচলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে যে পর্যায় মানব মস্তিষ্কে বিমূর্ত চিন্তা সম্ভব হয়েছে সেই মুহূর্তেই ঈশ্বর নিরাকার রূপ ধারণ করেছে।

ঐতিহাসিক যুগ

মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক যুগ, যার লিখিত ইতিহাস আছে – তা হলো শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ইতিহাস। সমাজ বিকাশের ধারা অনুযায়ী আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে শ্রেণী বিভক্ত দাস সমাজের উদ্ভব হলেও পৃথিবীর সর্বত্র তা একই সঙ্গে এবং একই মাত্রায় পৌঁছায়নি, একই সময় অবসানও হয়নি। ১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দাস ব্যবস্থার আধিপত্যের যুগ। আবার পুরানো সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে যেমন নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, তেমনি নতুন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও পুরানো সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি বহুদিন থেকে যায়। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, আব্রাহাম লিঙ্কনের সময় (যিনি নিজেও দাস প্রথার অবসান চাইতেন) দাস প্রথা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা করায়, জন ব্রাউনকে ভার্জিনিয়া আদালত রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করে ফাঁসি দেয়। দাস যুগে ভারতে হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদী ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্মের উদ্ভব হয়। দাস যুগেই আরবে ইসলাম ধর্মের উদ্ভব এবং সামন্ত যুগে ভারতে শিখধর্মের উদ্ভব হয়।

এই ধর্মগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, আলোচ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু আলোচ্য বিষয় বস্তুর প্রয়োজনে এই ধর্মগুলি সম্পর্কে দু-চার কথা উল্লেখ করা হলো।

দাস সমাজে

ক) হিন্দু ধর্ম প্রসঙ্গে

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী ভারত উপমহাদেশে, "হিন্দু" বলে কোনও ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। পূর্বে ধারণ ছিল, হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আর্য জাতি আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল তাই হলো হিন্দু ধর্ম। শুরুতে প্রকৃতির উপাসনাই ছিল এই ধর্মের মূল। কিন্তু ১৯২২ সাল থেকে পর্যায়ক্রমিক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারের আবিষ্কারের ফলে আধুনিক ঐতিহাসিকরা আর্যপূর্ব সিন্ধু সভ্যতা যুগের ভারতীয় দর্শনকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহেঞ্জোদারোর খনন কার্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকা স্যার জন মার্শাল কর্তৃক ১৯৩৯ খ্রিঃ প্রকাশিত বিবরণী থেকে এ বিষয় প্রমাণিত যে, যারা বেদ রচনা করেছিলেন তারা সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তোলেন নি। সিন্ধু সভ্যতার লিপি আজও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হলে এই সভ্যতা সম্পর্কে বহু প্রশ্নের সমাধান হবে। ধারাবাহিক প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের সুবাদে জানা যায় যে, বৈদিক আর্যরা এদেশে আগমনকালে লিপিহীন ছিল – হয়তো এই কারণেই বেদ প্রাথমিক পর্যায়ে "শ্রুতি" (মুখে মুখে প্রচারিত) ছিল। বৈদিক ও প্রাকবৈদিক যুগের তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুমান করা হয় যে সিন্ধু সভ্যতায় ধর্ম বিশ্বাস ছিল মাতৃ প্রধান এবং বৈদিক সভ্যতায় ধর্ম বিশ্বাস ছিল পুরুষ প্রধান। পৃথিবী বা প্রকৃতির ফলপ্রসূতামূলক কামনা থেকেই বসুমাতা বা আদ্যাশক্তি বা জগদম্মা পরিকল্পনার উৎপত্তি। এই বসুমাতা কল্পনার উৎসে আছে এক আদিম বিশ্বাস – যে বিশ্বাস অনুযায়ী প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা ও মানবীয় ফলপ্রসূতা সমগোত্রীয়। তাই শস্য দায়িনী প্রকৃতি, স্তন্যদায়িনী মাতার অনুরূপ। তাই প্রকৃতিও মাতৃরূপে কল্পিত।

সুতরাং হিন্দু ধর্মকে শুধুমাত্র বেদমূলক মনে করার কোন কারণ নেই। এর প্রধান উপাদান হলো আর্যপূর্ব বা অনার্য। অনেকের মতে প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত যে কোন ধর্মই হিন্দু ধর্ম, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ চিন্তায় অনেকেই শুধুমাত্র বৈদিক ধর্মকেই হিন্দু ধর্ম বলে। হিন্দু ধর্মের প্রথম সিদ্ধান্ত হলো – ঈশ্বরের অস্তিত্ব, দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো – ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং সর্বত্র বিরাজমান। হিন্দু ধর্মে ১) জন্মের পৌণঃপুনিকতা অর্থাৎ জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত, ২) বর্ণাশ্রম অর্থাৎ শ্রেণীভেদ প্রথা স্বীকৃত। ৩) মনুর মতে ভূমিহীন, ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন শ্রেণীর জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণীর কাজ করার জন্য। ৪) মনুর রচনায় বলা হয়েছে শূদ্র হলো ব্রাহ্মণের দাস। আজীবন তাকে দাসত্ব করে যেতে হবে। দাসত্ব থেকে কেউ মুক্তি দিলেও সে দাস থেকে যাবে। এছাড়া শূদ্র ধন উপার্জন করলেও ব্রাহ্মণ তা কেড়ে নিতে পারবে, কারণ বেদে শূদ্রের ধনে অধিকার দেওয়া হয়নি। ৫) মনু নারী জাতির স্বাধীনতা অনুমোদন করেন নি।

হিন্দুধর্মের সামাজিক কাঠামোয় ব্রাহ্মণরা এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। ব্রাহ্মণরাই এই সনাতন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছেন – যা **ব্রাহ্মণ্যবাদ** নামে, বলা ভাল **ব্রাহ্মণ্য ধর্ম** রূপে পরিচিত। ভারতে সুঙ্গযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ব্যাপকভাবে পল্লবিত হয়। এই সময়কালেই "রামায়ণ" ও "মহাভারত" মহাকাব্য দুটি রচিত ও প্রচারিত হয়। এই দুই মহাকাব্যেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। রাম ও কৃষ্ণের অবতারত্বকে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় রূপ দিয়ে প্রোথিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই দুই মহাকাব্যে একদিকে প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক স্তর বিন্যাসকে ধর্মীয় আবরণে ঢেকে চিরায়ত করার উদ্দেশ্যে এবং অন্যদিকে ধর্মীয় আবরণে প্রচার করা হয়েছিল প্রাচীন আর্যসামাজিক কাঠামোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কতগুলি পারিবারিক বিধান যথা পত্নীর উপর পতির, পুত্রের উপর পিতার, অনুজের উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও অধিকার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শূদ্রদের জোড় করে বেগার খাটানো সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত বলা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য ও রাজানুজ কথিত বৈষ্ণব ধর্মে জাতি-বিচার নেই। কিন্তু বেদান্ত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, বৈষ্ণব ধর্মকে হিন্দু ধর্মের শাখা বলে গণ্য করা হয়।

ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত তাঁর, "ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি" গ্রন্থে হিন্দুযুগ অধ্যায়ে লিখেছেন, "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নানা জাতির টোটেম বিশ্বাস জনিত সংস্কার, হিন্দুর ধর্ম বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করেছে। এই গ্রন্থের এই অধ্যায় তিনি আগেও বলেছেন, "আজ হিন্দু সমাজ অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব নিয়মকানুন, সামাজিক রীতিনীতি ও পুরোহিত প্রভৃতি দ্বারা একে অন্য হইতে পৃথকীকৃত। এই জন্য বলিতে হয় হিন্দু সমাজ বিভিন্ন সমাজের সমষ্টিমাত্র। একটা কেন্দ্রীভূত রাজনীতিক –

সামাজিক শাসনের অভাবে এক জাতিত্ব প্রাপ্ত না হইয়া বিভিন্ন লোকসমষ্টি বিভিন্নভাবে গতিশীল হইয়াছে। এজন্যই রাজনীতি ক্ষেত্রে বলা হয় যে হিন্দুরা শতধা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ইহাতে এই সকল উচ্চ-নীচ জাতিরা আদৌ লজ্জিত নয়।"

হিন্দু ধর্ম প্রসঙ্গে বি ওয়াকার এক সময় বলেছিলেন যে "এর সর্বব্যাপী প্রকৃতি এবং নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ পরম্পরার ফলে হিন্দু ধর্ম নির্দিষ্ট সজ্ঞার অতীত। কারণ এই ধর্ম কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস, কোনো বাঁধা ধরা মতবাদ অথবা কোনো সাধারণভাবে স্বীকৃত বিধি বিধান তুলে ধরে না। খ্রিস্টধর্মের গীর্জার মত কোনো সংস্থা এর নেই। আর সকলের জন্য অবশ্য পালনীয় কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানও নেই। সুতরাং হিন্দু ধর্মকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায় না।"

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সিন্ধু থেকে 'হিন্দু' উৎপত্তির ধারণা সন্দেহের অতীত নয়। "এক হিন্দু আত্ম পরিচয়ের খোঁজে" গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ যা বলেছেন, "যদিও বেদ বা পুরণে কোথাও কোথাও এটি থাকলেও হিন্দু শব্দটি সংহত রূপ ধারণ করে উপনিবেশিক শাসনকালে। এমনকি ভারতের ধারণাটাও সংহত রূপ ধারণ করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি। 'হিন্দু' শব্দটি মধ্যযুগের আঞ্চলিক ভাষায় ভক্তিসাহিত্যে খুব কম পাওয়া যায়। ... এসবের মধ্যে হিন্দু বা হিন্দু ধর্মের অর্থ নিয়ে কোনো পরিষ্কার আলোচনা নেই। ... মধ্যযুগীয় সন্ত ও ভক্তি আন্দোলনের কবিরা আসলে হিন্দু বলতে ব্রাহ্মণ্য জাতকেন্দ্রিক ভাবনার অনুসারীদের বোঝাতেন যার বিরুদ্ধে ঐ কবিরা আন্দোলন করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক যুগের আগে সংস্কৃত শাস্ত্রে 'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম' শব্দ দুটির অনুপস্থিতি এবং ভক্তি আন্দোলনের কবিতায় দু একটি উল্লেখ তাদের অর্থের সীমিত পরিসর এটাই বোঝায় যে ভারতীয়রা নিজেদের জন্য কোনো হিন্দু ধর্মীয় পরিচয় গঠন করে নি।"

সুতরাং হিন্দু একটি সংহত ধর্ম নয়, এর কোনো আদি প্রবক্তা নেই। কোনো একটি কেন্দ্রীয় ধর্মগ্রন্থ নেই। ফলে পরমত সম্পর্কে এর কোনো নির্দিষ্ট মনোভাব নেই। না প্রতিরোধ না সহিষ্ণুতার। প্রকৃতপক্ষে আর্য এবং আর্যপূর্ব ভারতের মানুষ ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ন্যায় প্রকৃতির উপাসক – যা সনাতন ধর্ম নামে পরিচিত। এই সনাতন ধর্মের তেমন কোনো তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ভিত্তি না থাকায়, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে, "বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে" ভারতীয় সনাতন ধর্মের কেউ আমন্ত্রিত ছিল না। ভারতীয় রাজা মহারাজাদের একাংশের প্রচেষ্টায়, এক ইংরেজের কাছ থেকে নেওয়া পরিচয় পত্রের ভিত্তিতে শ্রী নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ঐ ধর্ম সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে উপনিষদকে বেদান্ত নাম দিয়ে তাকে হিন্দু ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি স্বরূপ ঘোষণা করেন। বর্তমানে হিন্দু পুরোহিতদের জন্য আলাদা কোর্স ও ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

বস্তুত ভারতীয় উপমহাদেশ প্রাকৃতিকভাবে শস্য শ্যামলা থাকায়, ইউরোপের ন্যায় দাস বিদ্রোহ এখানে দেখা দেয় নি। তথাপি বেদ-বেদান্তে বর্ণাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্যতীত শূদ্রদের ধর্মাচরণের অধিকার ছিল না। বেদ, উপনিষদে বর্ণিত শূদ্রদের অধিকার থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, আদি ভারতীয় সমাজে শূদ্ররাই দাস রূপে পরিগণিত হতো।

খ) চার্বাক দর্শন প্রসঙ্গে

প্রাক বৌদ্ধ যুগে এই ভারতবর্ষে, অলৌকিকবাদকে অস্বীকার করে **প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক দর্শন রূপে** চার্বাক দর্শন তথা লোকায়ত দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছিল। বিপক্ষ সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের গ্রন্থে চার্বাক বা লোকায়ত মতের খন্ডন প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিই চার্বাক দর্শনের অস্তিত্বের প্রমাণ। এই দর্শনের নিজস্ব কোনো গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়নি। পরোক্ষভাবে যা জানা যায় তা হলো – এরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল, ঈশ্বর ও পরলোকের কথা তাদের কাছে কল্পনামাত্র। তাদের দাবি ছিল – বেদ প্রমাণিত নয় এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ শুধু অর্থহীন নয় – প্রবঞ্চনা মূলকও।

গ) বৌদ্ধ ধর্ম প্রসঙ্গে

বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি মূলত হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। বৌদ্ধ ধর্ম বেদকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করে না। বৌদ্ধদের ঈশ্বর নেই। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ৫৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শাক্য উপজাতি পরিবারে গৌতম জন্ম গ্রহণ করেন। সাধনার মাধ্যমে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে তিনি নিজেকে বুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ২৪৭ অব্দে সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে উদ্ভব হলেও ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল। আনুমানিক খ্রিস্টাব্দের প্রথম শতকে সম্রাট কণিষ্কের আমলে, চতুর্থ সম্মেলনের পরে সংঘ**হীনযান** ও **মহাযানে** বিভক্ত

হয়ে যায়। হীনযান শাস্ত্রটি পালি ভাষায় লেখা – সিংহল, বার্মা, শ্যাম দেশে (ইন্দোনেশিয়া) সংরক্ষিত। মহাযান শাস্ত্রটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা – নেপাল, চীন, জাপান, তিব্বতে সংরক্ষিত। ত্রিপিটক মূলত হীনযানী – পালি ভাষায় লেখা।

বৌদ্ধরা দেহাতিরিক্ত আত্মায় বিশ্বাস করে না – আত্মা স্থির কোনো বস্তু নয়। বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মের নীতি ও নিয়মাদি পালনের উপর গুরুত্ব দেন। দর্শনের উপর নয়। দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম কর্মবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দশটি দার্শনিক প্রশ্ন বুদ্ধদেব এড়িয়ে চলতেন। সেগুলি হলো বিশ্বের উৎপত্তি বিস্ময়কর অর্থাৎ শাশ্বত না অশাশ্বত, সীমিত না অসীম, দেহ ও প্রাণ একই না পৃথক ... ইত্যাদি। হীনযান বৌদ্ধ ধর্মে বহু মূর্তি পূজার প্রচলন ছিলনা। পরবর্তীকালে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে বহু দেবতার পূজা শুরু হয়। বৌদ্ধদের মধ্যে ব্রজজানী সাধনায় সবচেয়ে বেশি মূর্তি পূজা প্রচলিত হয়, যা তন্ত্র সাধনার সঙ্গে যুক্ত। বৌদ্ধদের মতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার ছিল। বৌদ্ধ ধর্মমতে যে কেউ নির্বাণ লাভে আগ্রহী হলেই সন্ন্যাস গ্রহণে কোনো বাধা নেই। বৌদ্ধ ধর্মে বর্ণভেদ প্রথা না থাকায় এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে 'জাতকের গল্প' যা আসলে জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব। বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিশরণ হলো বৌদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ বিষয়ক – বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি , ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।

ঘ) জৈন ধর্ম প্রসঙ্গে

জীন শব্দের অর্থ হলো বিজয়ী, রাগ-দ্বেষ জয় করে যারা মুক্তি লাভ করেছিল তাঁরাই জীন। অতি সুপ্রাচীনকালে ঋষভদেব এই ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন বলে মনে করা হয়। ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে মহাবীর ছিলেন শেষ তীর্থঙ্কর। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীরের মতে জীবের দেহ-মন সবই পূর্ব জন্ম অনুযায়ী হলেও স্বকীয় কর্মবলে জীব নিজেই নিজের ভবিষ্যত অনেকখানি গড়ে নিতে পারে। মহাবীর নারীদের সংঘ গ্রহণে কোনো আপত্তি করেন নি এবং গৃহস্থগণকে সংঘে সম্মানজনক স্থান দেওয়ায় সংঘের স্থায়ীত্ব দীর্ঘ হয়। এই ধর্মের মূল কথা হলো সর্বজনীন অহিংসা এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি না করা। তাই পশুবলি নিষিদ্ধ। **জৈনরা বেদও মানে না, ঈশ্বরও মানে না।** এই দর্শন মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই জীব বা চেতন এবং আজীব বা অচেতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আত্মাকে ধারণ করা যায় না, কিন্তু বাস্তব পদার্থের চরিত্রের মধ্যে একে বোঝা যায়। জীব নির্বাণ লাভ করে জন্ম-মৃত্যু চক্রের বাইরে চলে যায়। জৈন ধর্ম অনুযায়ী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করার জন্য সৃষ্টি তত্ত্ব বা স্রষ্টা ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই। কালক্রমে জৈনরা **শ্বেতাম্বর** ও **দীগম্বর** – এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। এরও পরে শ্বেতাম্বরদের মধ্যে তেরাপন্থীরা ও দীগম্বরের মধ্যে সামাইয়ারা মূর্তি পূজা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে।

প্রাচীন ভারত

চেরবাটস্কির মতে ভারতে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানে অব্যবহিত পূর্বে বহু বিচিত্র মতবাদের প্রচলন ছিল। এই যুগটি ছিল প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন চীনের দর্শন চর্চার যুগের প্রায় সমসাময়িক। ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য বিচার-বিশ্লেষণের উর্ধ্বে। দার্শনিক দৃষ্টিকোণে এই বৈশিষ্টের কারণ হলো পশ্চিমে যেমন বিস্ময় বা জিজ্ঞাসা থেকে দর্শনের জন্ম, ভারতে তা নয়। পক্ষান্তরে জীবনের নৈতিক ও ঐহিক গ্লানির অস্তিত্ব জনিত বাস্তব প্রয়োজনের চাপ থেকে ভারতে দর্শনের জন্ম। ফলে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও পৌরাণিক কল্পনা থেকে ভারতীয় দর্শনের মুক্তি অসম্পূর্ণ। কিন্তু ইউরোপে সুপ্রাচীন কাল থেকেই ফিলসফি অর্থে দর্শন চর্চা ও ধর্ম সাধনার মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট। অন্তত ঐতিহাসিকভাবে ভারতে দর্শন ও ধর্ম অনেকাংশে একাকার হয়ে গেছে। ইউরোপে পৌরাণিক কল্পনা থেকে মুক্ত গ্রীক দার্শনিক থ্যালিস (খ্রিস্ট পূর্ব ৬৪০-৫৫০) বলেছিলেন – জলই পরম সত্ত্বা, জল থেকেই সবকিছুর জন্ম। বর্তমানে যে আর্থে আমরা 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' শব্দ ব্যবহার করি – ভারতীয় দর্শনে তা করা হয় না। **ভারতীয় দর্শনে 'আস্তিক' মানে বেদ বিশ্বাসী এবং 'নাস্তিক' মানে বেদ অবিশ্বাসী।**

ভারতে দাস ব্যবস্থার মধ্যেই ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের দিনে ভ্রাম্যমান বণিক শ্রেণীর পক্ষে রাজন্যদের মৈত্রী ছিল বিশেষ প্রয়োজনীয়। অথচ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজন্যবর্গ তখনও যজ্ঞ ধর্মের পক্ষপাতি। কৃষি ব্যবসায়ী বৈশ্যদের কাছে ভারবাহী পশুর চাহিদা খুব বেশি কিন্তু যজ্ঞের নামে অনিয়ন্ত্রিত পশুবলি (বিশেষত মহিষ) তাদের শ্রেণী স্বার্থের প্রতিকূল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক কারণেই পশুহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ঐশ্বর্যবানদের সাড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের নিস্পৃহতা এবং উৎপাদিকা শক্তির অর্থহীন অপচয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগ্রহকে বলবান করেছিল। এইরূপ সামাজিক অবস্থায়

বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক ধর্মমতের মাধ্যমে যজ্ঞের অর্থহীন মূল্য ও বলিদান প্রথার মিথ্যা তাৎপর্য জোরালোভাবে প্রত্যাখাত হলো। নৈতিক মূল্যায়ন হিসাবে অহিংসার প্রয়োজন প্রচারিত হলো। সমাজে এইরূপ পরিবর্তনগুলির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন রইল না।

বুদ্ধদেব ছিলেন শাক্য উপজাতির রাজা, ব্রাহ্মণদের চোখে নিচু জাত। পরে উচ্চ বর্ণের মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম মর্যাদা পায়। সম্রাট অশোক বণিক পুঁজির পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

বুদ্ধের সুত্তনিপাত গ্রন্থে নিষেধের তালিকায় নাগরিক জীবনে সাধারণ পান ভোজনশালার ব্যবহার, গণিকাবৃত্তি, সুদ দেওয়া, ক্রিতদাস প্রথা – প্রভৃতি বণিক শ্রেণীর মুখ্য প্রয়োজনগুলি নিন্দিত হয়নি। বরং পাওনাদারদের প্রাপ্য না দেওয়া, সুদ ফাঁকি দেওয়া প্রভৃতি অন্যায় বলে ঘোষিত হয়েছে। বৈদিক যুগে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য করা হতো যে বৈশ্যদের, বৌদ্ধ ধর্ম সেই পক্ষেরই ওকালতি করেছিল।

ত্যাগ ব্রতের উপর কিছুমাত্র আলাদা গুরুত্ব না দিয়ে বরং অহিংসাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে মহাবীর প্রকৃতপক্ষে উদীয়মান বণিক শ্রেণীর উপযোগী ভাবধারাই প্রচার করেছিলেন। তাই রাজন্য ও বৈশ্যদের শ্রেণী মৈত্রীর দিনগুলিতে জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মের সমান্তরালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও কলিঙ্গ রাজ খারকেল জৈন ধর্ম গ্রহণ করায় এই ধর্ম বিস্তার লাভ করে। আজও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ জৈন।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে সাম্য প্রতিষ্ঠার যে বক্তব্য উল্লেখিত আছে – তা রূপায়নের কোনো কর্মসূচী প্রদান করা হয়নি। সাম্য প্রতিষ্ঠার বাস্তব উৎপাদন ব্যবস্থা সে যুগে যেমন আবির্ভূত হয়নি, তেমনি রাষ্ট্রের শ্রেণী সমাজের অনিবার্যতা রোধ করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। বিপরীতে সমাজে বারংবার অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বারংবার প্রকার ভেদ ঘটেছে – যা তৎকালীন অর্থনীতির সাংস্কৃতিক ফল ভিন্ন কিছুই নয়। বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম কখনোই সামাজিক আন্দোলন রূপে প্রকাশ পায় নি। ভারতীয় সমাজে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে মানুষ যে ধর্মাচারগুলি পালন করত – তা ছিল হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী। এর জন্য প্রয়োজন হতো ব্রাহ্মণদের। এর ফলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাধারণ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হলেও হিন্দু আচার, আচরণ এবং ব্রাহ্মণদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সম্রাট অশোক নিজে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেও প্রজাদের অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে ভ্রমণকারী চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধ ধর্মকে একটা সতন্ত্র ধর্মরূপে নয়, বরং হিন্দু ধর্মের একটি শাখা রূপে তৎকালীন মানুষ গণ্য করতো। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে ভ্রমণকারী চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ এবং ইৎ সিং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে গুপ্ত যুগেই হিন্দু মন্দিরের ন্যায়, বৌদ্ধ মঠে বুদ্ধ মূর্তির পূজা অর্চনা শুরু হয়।

ভারতে দাস ব্যবস্থার গর্ভে সামন্ত ব্যবস্থার ভ্রূণ সৃষ্টি এবং সেই ভ্রূণ পরিপূর্ণ আকারে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজনে সমাজে সামরিক শক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় – যা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অহিংসা নীতির পরিপন্থি হয়ে ওঠে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সময় সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে বাণিজ্য হ্রাস পায়, বৈশ্যদের প্রতিপত্তি খর্ব হয়। এইরূপ সামাজিক পরিবেশে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সমাজে কর্তৃত্বকারী ভূমিকা হ্রাস পায়।

ঙ) খ্রিস্ট ধর্ম প্রসঙ্গে

রোম সাম্রাজ্যে দাস ব্যবস্থার এক চূড়ান্ত পর্যায় প্যালেস্তাইনের বেথেলহেম শহরে এক ইহুদী দাস পরিবারে যীশুর জন্ম। যীশুই খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক বলে প্রচারিত। খ্রিস্ট শব্দের অর্থ ত্রাণকর্তা। ইহুদীদের মধ্যে ত্রাণকর্তা আবির্ভাবের কথা প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ হলো বাইবেল – ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট। যীশু বলেছিলেন সম্রাটকে বশ্যতা জানানোর চেয়ে অনেক বড় কর্তব্য হলো ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলা। কারণ সম্রাট তথা রাষ্ট্রের উপর আরও উচ্চস্তরের আইন হলো ঈশ্বরের আইন। যীশু নিজে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন, অথচ তিনি নিজে রাজা নন। স্বাভাবিকভাবেই দাস যুগে রাজার সর্বময় কর্তৃত্বের দার্শনিক ভিত্তি এতে আঘাত প্রাপ্ত হয়। সম্ভবত এই কারণেই রোমের দাস শাসক শ্রেণী ২৯ খ্রিস্টাব্দে যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করে।

এঙ্গেলসের রচনা থেকে পাওয়া যায় যে – খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাস ক্রমিক উদ্ভব প্রসঙ্গে ব্রুনো বাউয়ের গবেষণার অবদান সর্বাধিক। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী আলেকজান্দ্রিয় ইহুদী "ফিলো" খ্রিস্ট ধর্মের প্রকৃত জনক, আর রোমক স্টোইক সেনেকাকে বলা যেতে পারে সেটার পিতৃব্য। স্টোইক সেনেকা ছিল সম্রাট নিরোর পেনশন ভোগী গরীবের কাছে ধর্মোপদেশ প্রচারক।

বস্তুত গ্রীক স্টোইক দর্শনের সঙ্গে রূপাত্মক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে কল্পিত বিভিন্ন ইহুদী ঐতিহ্যের মিশ্রণের মধ্যে – পাশ্চাত্য প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গির মিলনের মধ্যেই খ্রিস্ট ধর্মের ভাব-ধারণা। মানুষের সহজাত পাপ প্রবণতা, প্রায়শ্চিত্ত – সেটা পশুবলি দিয়ে নয়, নিজ অন্তরকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে করতে হবে। এই অপরিহার্য উপাদানটা নতুন ধর্মীয় দর্শন জগতে পূর্ববর্তী ব্যবস্থাটাকে উল্টে দেয়। শিষ্য খোঁজে গরীব, দুর্দশাগ্রস্থ দাস আর যারা পরিত্যক্ত, তাদের মধ্যে। আর ধনী ক্ষমতাশালী এবং বিশেষ সুবিধাভোগীদের দেখে ঘৃণার চোখে। সেখান থেকেই সমস্ত পার্থিব সুখভোগের প্রতি ঘৃণা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্মানুশাসন। এই দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বর্তমানকালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক হ্যানসি ক্রোনিয়ে বেটিং চক্রে ধরা পড়ে চার্চে গিয়ে পাপ স্বীকার করে আত্মহত্যা করেন।

গ্রীক ও রোমক উভয়ের গ্রহণযোগ্য করে, সাধারণের উপযোগী করে ফিলোনিক ধারণাগুলি দিয়েই খ্রিস্ট ধর্মের যাত্রা শুরু। স্টোইকদের সেনেকার দর্শন নির্ভর করে নিউটেস্টামেন্টের উপদেশ বাণী গড়ে উঠতে থাকে। এই উপদেশ বাক্য ছিল একদিকে যীশু কাহিনী প্রসঙ্গে, অন্যদিকে ইহুদী ও পেগানদের থেকে উদ্ভূত খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গ।

স্পার্টাকাসের পরাজয়ের পরে রোমের বিপুল দাস জনগণ নিজেদের মুক্ত করার ক্ষমতায় আস্থাহীন হয়ে পড়ে। তাদের কাছে বর্তমান ছিল অসহ্য, আর ভবিষ্যত ছিল ভয়াবহ। বৈষয়িক চরম অভাব যে হতাশা সৃষ্টি করেছিল তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিজেদের চৈতন্যের মধ্যে সান্ত্বনা লাভের আশায় খোঁজ চলছিল আধ্যাত্মিক উপায়ের। এই সান্ত্বনা জোগানোর জায়গায় ছিল না ভাববাদী স্টোইকরা, না ছিল নাস্তিক – বস্তুবাদী এপিকিউরাসরা। এই সার্বিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বুদ্ধিবৃত্তিগত ও নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল খ্রিস্টধর্ম। সমস্ত জাতিগত ধর্ম, (মিশরী, ইহুদী, পারসিক, ক্যালডীয়) এবং সেগুলির আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রত্যাখ্যান করে এবং কোন প্রভেদ না রেখে সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে খ্রিস্টধর্ম হয়ে উঠল প্রথম সম্ভাব্য সর্বলৌকিক ধর্ম। নতুন সর্বজনীন দেবতা নিয়ে ইহুদী ধর্মও সর্বলৌকিক ধর্ম হয়ে ওঠার দিকে পা বাড়িয়েছিল কিন্তু ইজরায়েলের ইহুদীরা একটা অভিজাত সম্প্রদায় রূপে থেকে যাওয়ায় ইহুদী ধর্ম সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি।

সার্বিক বৈষয়িক ও নৈতিক দুর্দশা সম্বন্ধে সমস্ত অভিযোগের জবাবে পাপ সংক্রান্ত খ্রিস্টানী চৈতন্য বলেছিল – দোষ দিতে হবে তোমাকেই জগতের বিকৃতির জন্য, তোমার এবং তোমার অভ্যন্তরীণ বিকৃতির জন্য দোষী তোমরা সকলেই। "Mea Culpa" অর্থাৎ আমি পাপী। সর্ব দুর্ভাগ্যের জন্য দায়িত্ব প্রত্যেকের, সকলের অংশ মেনে নেওয়াটা ছিল অখন্ডনীয় আর সেটা করা হয়েছিল আত্মিক মোক্ষের পূর্ব শর্ত। সুতরাং মানুষেরা নিজেরাই সর্ব বিকৃতির জন্য দোষী – এই অনুভবটাকে প্রত্যেকেরই পাপের চেতনা হিসাবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করল খ্রিস্টধর্ম।

অসন্তুষ্ট দেবতাকে শান্ত করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ধারণা প্রচলিত ছিল সমস্ত পুরানো ধর্মে। সেক্ষেত্রে যিনি মধ্যস্থ তাঁর আত্মবলিদান করে মানবজাতির পাপ সমূহের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করার ধারণা সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। যীশু পরিণত হলো দেব বিগ্রহে – যিনি আত্মবলিদান করে মানবজাতিকে পাপমুক্ত করেছেন।

খ্রিস্টধর্মে কোথাও দাস প্রথা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি। খ্রিস্ট ধর্ম ইহলোকে সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে চায় নি, সেটা চেয়েছিল পরলোকে, স্বর্গে, মৃত্যুর পরে। খ্রিস্টধর্ম কিরূপে সর্বলৌকিক ধর্ম হয়ে উঠল সেটা প্রথম তিন শতাব্দীর চার্চের ইতিহাসে বিস্তারিতভাবে শেখানো হয়। এই কারণে যে, যে শাসকশ্রেণী যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল, যে শাসকশ্রেণীর সম্রাট নিরো নির্বিচারে ও নির্মমভাবে খ্রিস্টানদের হত্যা করেছিল, সেই শাসকশ্রেণীর সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে ঘোষণা করে।

যীশুর অহিংসার বাণীতে, নিজ ক্ষমতায় আস্থাহীন রোমক দাসেরা যে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। সেই অহিংসার বাণী ধর্মযাজকদের খাঁচায় বন্দি ও রূপান্তরিত হয়ে শাসকশ্রেণীর হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ধর্মের বিস্তার ও রাজ্যজয় একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

চ) ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে

আরবে, আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ মক্কা শহরে এক পৌত্তলিক কোরেশ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় গিয়ে তার ধর্মমত গঠন করেন। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে এই ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেন এবং জয়যুক্ত হয়ে মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলাম ধর্ম এমনভাবে তার বিধি নিষেধ সৃষ্টি করেছিল যা

ছিল আরবদের পক্ষে মানানসই। একদিকে শিল্পে ও বাণিজ্যে যুক্ত শহরবাসী অন্য দিকে গরীব বেদুইনরা। শহরবাসী হয়ে ওঠে ধনী, বিলাসী, বিধিবিধান মেনে চলায় অমনোযোগী। বেদুইনরা গরীব, তারা নৈতিক চরিত্রের বিষয়ে কঠোর। তারা কাফেরদের শাস্তি দেবার জন্য আচার পালন আর সাচ্চা ধর্মবিশ্বাস পুনঃস্থাপনার এবং খেসারত হিসাবে কাফেরদের ধনদৌলত বাজেয়াপ্ত করার জন্য মিলিত হয় একজন মহদির অধীনে। স্বাভাবিকভাবেই তারা একশ বছরের মধ্যে কাফেরদের অনুরূপ জায়গায় পৌঁছে যায়। ধর্মমতের নতুন বিশোধন প্রয়োজন হয়, দেখা দেয় এক নতুন মহদির, আর ব্যাপারটা আবার শুরু হয় গোড়া থেকে। স্পেনে আফ্রিকার আলোমোরাভিদ আর আলমোহাদদের দেশজয় অভিযান থেকে ইংরেজদের সাফল্যের সঙ্গে শায়েস্তাকারী খার্তুমের মাহ্‌দি অবধি তাইই ঘটেছিল। পারস্য এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে অভ্যুত্থানগুলির বেলায়ও ব্যাপারটা ঘটেছিল একই কিংবা অনুরূপ ধরনের। এই ঘটনাগুলির প্রকৃত কারণ ছিল অর্থনৈতিক। কিন্তু ঐ অভ্যুত্থানগুলি জয়যুক্ত হওয়ার পরে অর্থনীতির পরিবর্তন না করায় অনুরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান থেকে যায়।

ইসলাম ধর্ম এমন এক সময় আবির্ভূত হয়েছিল যখন প্রাচীন সভ্য দেশগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রীতিমতো ঘুণ ধরে গিয়েছে। শোচনীয় দুর্গতি ও নানাবিধ অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে একটা উন্নততর জগতের সন্ধান পাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতম রূপ ধারণ করেছে। ইসলাম সে সময় সাম্য ও মুক্তির বাণী নিয়ে হাজির হয়। বণিক পুঁজির সমর্থনে, অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে পার্থিব জগতে, হতাশা নিরাময়ের প্রেরণা জোগায়। এই নতুন ধর্ম ইহলোকের সুখ ও পরলোকে শান্তির সন্ধানে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল।

ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর একটি বিশেষ দিক হলো রাজনৈতিক ইসলাম। যা হলো – ১) আল্লাহ্‌র ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করো, জেহাদ ঘোষণা করো এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করো। ২) অন্য রাষ্ট্রে ইসলামের দাওয়াত পাঠাও, কবুল না করলে আক্রমণ করো এবং পদানত করে, ইসলামী শাসন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করো।

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আল্লাহ এক, অনাদি, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সকল কিছুর নির্ভরস্থল, তার সমকক্ষ কেউ নেই। ইসলাম অবতারবাদ সমর্থন করে না। নিরাকার একেশ্বরবাদই ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। ইসলাম ধর্ম যেমন রাজ্যজয়ের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করেছিল, তেমনি রাজ্যের প্রজা ও যুদ্ধ বন্দিদের ধর্মান্তরিত করার মধ্য দিয়েও বিস্তার লাভ করেছিল। মহম্মদের মৃত্যুর কিছুদিন বাদে তার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ও কোরান সংকলন সংক্রান্ত বিষয়ে মতভেদের ভিত্তিতে মুসলিমরা **শিয়া** ও **সুন্নী** – দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভ পাঁচটি – **কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ** – এই পাঁচটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। মুসলিম ধর্মে পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে বহু ক্ষেত্রেই ইমামতন্ত্র, পুরোহিত তন্ত্রেরই নামান্তর। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনই সর্বপ্রথম মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করে।

আরব ছিল মুসলমানদের দাস ব্যবসার মূল কেন্দ্র। খিলাফৎ যুগে দাস ব্যবসা একটি লাভজনক ব্যবসা ছিল। কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, উভয় প্রকার দাসই আরবের বাজারে আমদানি করা হতো। যদিও হজরত মহম্মদ নিজের দাস জায়েদকে মুক্ত করে দিয়ে জাতির কাছে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তথাপি রাজা, উজীর, আমীর, শেখদের বাণিজ্যে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেননি। প্রথমদিকে আরবদের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে সাধারণভাবে শেখ, সৈয়দ, মুঘল, পাঠান, তুর্কি প্রভৃতির মধ্যেও আশরাফ ও আতরাফ ভিত্তিক নাগরিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধনিক শ্রেণীর দানে গরীব শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রাখার ব্যবস্থা হলো – জাকাত। তাই জাকাত করার জন্য ধনীদের বার বার অনুপ্রাণিত করে ইসলাম ধর্ম। এমন একটা ভাবাবেগ সৃষ্টি করা হয়েছে যেন ধনীর ধনের উপর তার একার অধিকার নেই, দীন ও দরিদ্রেরও অধিকার আছে। আসলে জাকাতের মাধ্যমে সমাজের বৈষম্যমূলক অর্থনীতিকে (বাণিজ্য) গতিশীল রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

কোরান শরিফ হলো ইসলামের ধর্মমত, 'হাদিস' হলো সামাজিক অনুশাসনের নিয়ম নীতি। যে সকল সমস্যার সমাধান কোরান-হাদিসে নেই, কোরান হাদিসের আলোকে সেগুলি সমাধানের জন্য রচিত আইন হলো 'ইজমা'। আর যেসকল সমস্যা সমাধানের কোন সূত্রেই কোরান-হাদিসে নেই, সেগুলির সমাধান জন্য প্রণীত আইন হলো, 'কিয়াস'। প্রকৃতপক্ষে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আইনের পরিবর্তনের উদাহরণ হলো 'ইজমা' ও 'কিয়াস'।

ইসলামের মূল নীতিতে আধুনিক শিক্ষার কোনও স্থান নেই। ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের বৃহৎ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগ

বলা হয় 'উমাইয়া যুগ'কে। যা আরও উজ্জ্বল করে তোলেন আব্বাস বংশের খলিফাগণ – যা তৎকালীন বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। সে সময় রাষ্ট্র ধর্ম স্বরূপ, 'মুক্তজীলা' নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল যা বিশুদ্ধ ইসলাম নয়। পৃথিবী ব্যাপী ইসলাম ধর্মের সাফল্যের কারণ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের গুরুত্বের উপর আরোপিত।

দাস ব্যবস্থায়, বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উদ্ভব ও প্রসারের পাশাপাশি দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ধীর গতিতে হলেও ঘটতে থাকে। ধর্ম, শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করায় ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর সার্বিক সহযোগিতা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি এবং ধর্মের কান্ডারিরা পেতেন কিন্তু বহুক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের গবেষণা প্রধানত ব্যক্তিগতভাবে এবং ধর্মের কান্ডারিদের আড়ালে চলত। বিজ্ঞানের গবেষণা ও ফলাফলগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা ক্ষেত্রে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হতো। বিশেষত চিকিৎসা বিজ্ঞানে। তথাপি দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রীসে হেরাক্লিটাস, থ্যালেস, ডেমক্রিটাস, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ আবির্ভূত হন। তর্কবিদ্যা ও অধিবিদ্যার প্রসার ঘটে। আলেকজান্দ্রিয়াতে বিজ্ঞানের প্রসার, লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। ইউক্লিড কর্তৃক জ্যামিতির উদ্ভাবন, জুলিয়ান ক্যালেন্ডার, আর্কিমিডিসের হাইড্রোলিক্স আবিষ্কৃত হয়। প্রযুক্তিতে সিকল, ভালব, গিয়ার স্প্রিং, স্ক্রু ইত্যাদির উদ্ভাবন। রোমে স্থাপত্য বিদ্যার উন্নতি। উইন্ড মিল, ওয়াটার মিল, রোটারি মিল এবং সিমেন্টের ব্যবহার শুরু হয়, ভারতে গণিতে শূন্যের উদ্ভাবন ও দশমিক সংখ্যার ব্যবহার শুরু হয়। চীনে কাগজের উদ্ভব হয়।

দাস ব্যবস্থায় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল দাস শ্রম। দাসেদের উৎস ছিল যুদ্ধে পরাজিত বন্দি ব্যক্তি। যুদ্ধের সৈন্য করা হতো কৃষক ও হস্তশিল্পীদের নিয়ে এবং যুদ্ধের খরচ এদের উপর কর চাপিয়ে তোলা হতো। দাসের জোগান গতিশীল রাখতে ধারাবাহিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষক ও হস্তশিল্পীরা অচিরেই অবলুপ্ত হতে শুরু করে। অন্যদিকে দাস বিদ্রোহ বাড়তে থাকে এবং দাসেদের মধ্য থেকে জমির দাবি উঠতে থাকে। দাস অর্থনীতির বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ায় দাস পোষাও সমস্যা হয়ে পড়ে। পুরানো উৎপাদন ব্যবস্থার **দাস** ও **দাসমালিক** নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় **ভূমি দাস** ও **সামন্তপ্রভুতে** পরিণত হয়। শুরু হয় সামন্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ার যুগ – ইতিহাসে যা মধ্যযুগ বলে পরিচিত।

সামন্ত সমাজে

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে সামন্তযুগের অস্তিত্ব ছিল – বৃটেনে সপ্তদশ শতাব্দী, ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। রাশিয়াতে ঊনবিংশ শতাব্দী এবং ভারত ও চীনে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সামন্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। সামন্ত ব্যবস্থায় রাজা নির্দিষ্ট শর্তে সামন্ত প্রভুদের হাতে জমি বন্টন করে এবং সামন্তপ্রভুরা বাৎসরিক খাজনার বিনিময় জমিতে উৎপাদন করার শর্তে কৃষকদের জমি বন্টন করে। এটাই ছিল সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার সাধারণ রূপ। উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত ভোগ। এই রূপ অর্থনীতির স্বার্থে পুরানো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির শাসকশ্রেণীর পক্ষে ওকালতি করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সামন্ত অর্থনীতির স্বার্থে পর রাষ্ট্র গ্রাস করা স্বাভাবিক নীতি হয়ে দাঁড়ায়। পররাষ্ট্র গ্রাস করতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ব্যবহার শুরু হয়।

ধর্মযুদ্ধ

১০৯৫ থেকে ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলে ইতিহাসে তা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সাইন বোর্ডের আড়ালে ছিল দেশ দখল, সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার। ইসলাম প্রতিষ্ঠার দেড়শ বছরের মধ্যে পশ্চিমে মরক্কো থেকে পূর্বে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিরাট ভূখন্ড মুসলমান শাসকদের অধীনস্ত হয়। ইসলামের নীতি অনুযায়ী ঐ সব দেশের নাগরিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মুসলমানদের বিশ্বাস হজরত মহম্মদ এই পৃথিবীতে ঈশ্বর প্রেরিত শেষ পুরুষ। যীশু ঠিক তার আগে এই পৃথিবীতে ধর্ম-সমাজনীতি সম্বন্ধীয় চরম জ্ঞান মানুষকে বিতরণ করেছেন। কিন্তু একথা মানলে যীশুর অদ্বিতীয় – অনন্য সাধারণ হবার দাবিই থাকে না। বরং যীশু হয়ে পড়েন অসম্পূর্ণ বার্তা-বাহক। যে বার্তা ঈশ্বর আরও প্রায় ছয়শ বছর পরে পূর্ণ করে দিলেন হজরত মহম্মদের মাধ্যমে। মধ্যযুগে খ্রিস্টিয় সমাজে হজরত মহম্মদ হলেন ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ হবার নকল দাবিদার। এমতাবস্থায় এগারশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বারশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে চার্চ ও রাজা একযোগে উচ্ছৃঙ্খল নাইটদের আদব-কায়দা ও নৈতিকতাকে গৌরবমন্ডিত করে শিভালরি কর্তব্য প্রচার করে। শিভালরি শব্দটি ফরাসী 'শিভাল' শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ অশ্ব বা ঘোড়া। শিভালরি নাইটরা হলো পারদর্শী অশ্বারোহী যোদ্ধা। শিভালরি নাইটদের দুটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

প্রচারিত হয় –

১) ঈশ্বরের প্রতি অবিচল থেকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে যোগদান করা।

২) নাইট হওয়ার প্রাক্কালে সারা রাত ব্যাপী বিনিদ্র প্রার্থনা – যাকে বলে সেরিমনি অফ ডাবিং এ যোগদান।

এছাড়া আর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাইটকে যুদ্ধাস্ত্রের পবিত্রকরণ শুরু হয়। এই বিষয়গুলি আইনিভাবে প্রযুক্ত হয় নি। বিভিন্ন গাথায় মুসলমান তথা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানকে গৌরবান্বিত করা হয়। যে সব কবি এই সব গান বা গাথা রচনা করে রাজা বা সামন্ত প্রভুদের দরবারে পরিবেশন করতেন ফ্রান্সে তাদের 'ক্রুবেদর' বলা হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা হতো ধর্মীয় যাজক শ্রেণীভুক্ত। রানী এলেনর অফ অ্যাকুইনাইট সহ বিভিন্ন রাজন্য বর্গ, ক্রুবেদর-দের নিজ নিজ দরবারে স্থান দিয়েছিলেন। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই শিভালরি উচ্চ আদর্শ ইউরোপীয় নাইটদের নৈতিক চরিত্র গঠনে প্রভাব বিস্তার করে এবং এই সকল নাইটরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনের মত ধর্মীয় নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়। এই নীতিবোধই প্রত্যক্ষভাবে ক্রুসেডের ক্ষেত্র রচনা করে। এই ধর্মযুদ্ধ কিন্তু মুসলিম রাজাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে নি। কিন্তু বিপরীতে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ, সামন্তগণ, বণিক শ্রেণী এবং প্রতিযোগিতারত রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক সকলেই খ্রিস্টধর্মের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারীদের পাপমোচন, ঋণমকুব ও শাস্তি মকুবের অঙ্গীকারই খ্রিস্টান রাজন্যবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল। মধ্যযুগে ইউরোপের অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে উদ্ভূত সামাজিক অস্থিরতা ক্রুসেডের নামে বহিঃশত্রু অখ্রিস্টিয়দের রক্তক্ষয়ী নিধন-যজ্ঞে পরিচালিত হয়।

ইহুদীদের ধর্মীয় চিন্তাধারার বিবর্তনের ইতিহাস থেকে জানা যায় ইহুদী জাতি খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ১০০০ বা তারও পূর্বে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদ ও নিরাকারবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। মিশর দেশে বসবাসকালে অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে তাদের নেতা **মুসা**। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে নাগরিকদের স্বীকার করতে হতো সম্রাট/রাজা ঈশ্বরের সমান। যীশুর অহিংস বাণীতে, ঈশ্বরের সমমর্যাদার থেকে রাজার স্থানচ্যুতি ঘটে। ফলে যীশু ও তার শিষ্যদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। ইহুদী যাজকদের নাছোড়বান্দা অভিযোগের ভিত্তিতে রোমের বিচারক পন্টিয়াস পাইলেট নির্দোষ যীশুর মৃত্যু দন্ডের দায়ভার অভিযোগকারী ইহুদী যাজকদের উপর ন্যাস্ত করে যা খ্রিস্টান সমাজে ইহুদী বিদ্বেষের ভ্রূণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগে কোনও খ্রিস্টান রাষ্ট্রেই ইহুদীরা পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা পায় নি।

সামন্ত ব্যবস্থা চীনে তাঙ রাজবংশের আমলে চুম্বকীয় কম্পাস, বারুদ উদ্ভাবন ও ছাপার কাজ শুরু হয়। চিকিৎসায় চোখের ছানি অপারেশন সহ বিভিন্ন উন্নতি ঘটে। আমেরিকার গুয়াতেমালাতে মায়া সভ্যতার বিকাশ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা এবং অঙ্কে শূন্যের ব্যবহার শুরু হয়। জার্মানিতে আইন, দর্শন এবং ঔষধ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যুক্তিবাদের প্রসার ঘটে। ইতালিতে যুক্তি ভিত্তিক মানবতাবাদের প্রসার ঘটে। ইংলন্ডে রাজা জন কর্তৃক চার্চ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিকার স্বীকার করে মহাসনদে স্বাক্ষর করেন। জলপথে ভাস্কো দা গামা, কলম্বাস প্রভৃতি কর্তৃক নতুন নতুন দেশ ও মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয় ব্লাস্ট ফার্নেস। ওকহ্যাম ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যা খন্ডিত হয়। নিকোলাস কোপারনিকাস ও জোনাথন কেপলার গ্রহ-নক্ষত্রগুলির আবর্তন তত্ত্ব তাত্ত্বিক ও গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন। গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন যার সাহায্যে সূর্য কেন্দ্রীক গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে স্বর্গ ও মর্তের পৃথক অস্তিত্বের ধর্মীয় তত্ত্ব অসার প্রমাণিত হয়। আইজাক নিউটনের বলবিদ্যা ও মহাকর্ষ সংক্রান্ত আবিষ্কার ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগে বিশ্ব ও মহাবিশ্বের ঘটনাবলীর সংযুক্তি ঘটে। ইউলিয়াম হার্ভে কর্তৃক রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার, ভেসালিয়াস কর্তৃক শবদেহ ব্যবচ্ছেদ ঘটে। বয়েল কর্তৃক গ্যাসের আয়তন ও চাপের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়। স্যাভেরি কর্তৃক স্টিম ইঞ্জিন নির্মাণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ফ্লোরেন্স ও প্যারিসে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। লন্ডনে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, রয়্যাল সোসাইটি গড়ে ওঠে।

সামন্ত ব্যবস্থায় বিকাশের পর্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগ উৎপাদনকে এমন মাত্রায় উন্নিত করল যা আর সামন্ত অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলো না। পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হওয়ায় একদিকে সামন্তপ্রভুরা পণ্যের বাজারের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত করে (ইংলন্ডে) জমিকে পশুচারণ ভূমিতে পরিণত করল অন্যদিকে বণিকরা ক্ষুদ্র কৃষক ও হস্তশিল্পীদের দাদন দিয়ে উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। পরবর্তীতে এই বণিকরা শিল্প কারখানা স্থাপন করে মজুরির ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করে। কারখানার মালিকরা পরিণত হয় পুঁজিপতিতে এবং

কারখানায় শ্রমদানকারী কৃষক ও হস্তশিল্পীরা পরিণত হয় শ্রমিকে। নতুন উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে মানুষের চেতনার পরিবর্তন দেখা দিল। এইরূপ সামাজিক অবস্থায় ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন

ইউরোপে সামন্তবাদ গড়ে ওঠার যুগে খ্রিস্টধর্ম সব থেকে বেশি গঠনমূলক ভূমিকা নিয়েছিল। মধ্যযুগের খ্রিস্টিয় ধর্মতন্ত্র সামন্ত সমাজকে ঈশী আশীর্বাদ করেছিল। কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি রোধের জন্য খ্রিস্ট ধর্মের বাণী প্রচার করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে খ্রিস্টানরা রোমান ক্যাথলিক, গ্রীক অর্থডক্স, সিরিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই সম্প্রদায়গুলি এক একটি রাষ্ট্র জুড়ে একসাথে বসবাস করত। রাষ্ট্রের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ প্রায় ছিলই না। যখন ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব ব্যবসায়ীদের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল তখন ব্যবসায়ীরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতার দাবি তুলল এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নষ্টামি, ভন্ডামি ও বিলাসিতার নিন্দা করল। এই ব্যাপারে তারা কৃষকদের সমর্থন পেল। ইউরোপ এক ধর্ম বিদ্রোহের যুগে প্রবেশ করল। এ ছিল প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের মত ও পথের বিরুদ্ধে অন্যমত প্রচার। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী – কৃষকরা ছিল এদের মজুদ বাহিনী। খ্রিস্ট ধর্মের সংস্কারের যুগে প্রায় দুশো বছর ধরে প্রোটেস্ট্যান্টদের উপর পুরাতন খ্রিস্টিয় শাসকদের অকথ্য নির্মম অত্যাচারের অধ্যায়।

১৩৩৬ খ্রিঃ পোপের সেলামি, রাজাকে দেয় খাজনার প্রায় চার গুণ হওয়ায় ইংলন্ডের পার্লামেন্ট পোপকে সেলামি দিতে অস্বীকার করে। এর কয়েক বছরের মধ্যে অক্সফোর্ডের এক অধ্যাপক ওয়াইক্লিভ প্রচার করলেন যে মানুষের বিবেকের প্রকৃত বিচারক হলেন ঈশ্বর, পোপ নন এবং ধর্ম যাজকদের উপর সাধারণ আইন প্রযোজ্য হওয়া উচিত। ওয়াইক্লিভ গির্জার কর্তৃপক্ষ দ্বারা অত্যাচারিত হলেও সাধারণ কৃষক ও পেটিবুর্জোয়াদের সমর্থন পান। কিন্তু তার দ্বারা প্রভাবিত অধ্যাপক, 'জনহাস' বোহেমিয়াতে পোপের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করায় তাকে ধর্মচ্যুত করে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। এই ঘটনাই জার্মানদের বিরুদ্ধে চেক জাতির বিদ্রোহের সূচনা করে। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে তখন জার্মানরা প্রভুত্ব করত এবং প্রধান প্রধান ধর্মস্থানগুলি জার্মানদের দখলে ছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে একদিকে ছিল বড় বুর্জোয়া ও অভিজাত সম্প্রদায় – তাদের কেন্দ্র ছিল প্রাগে এবং তাদের লক্ষ্য ছিল গির্জার অধীনস্ত ভূসম্পত্তি ও খনিগুলি দখল করা। অন্য দিকে ছিল কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও শ্রমিকরা। শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব এসে পড়ে গণতন্ত্রীদের হাতে। বিদ্রোহের প্রধান দুই নেতা ছিলেন **মার্টিন লুথার** ও **টমাস মুয়েনজার**। কিন্তু ধর্মসংস্কার আন্দোলন যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপদ হয়ে দেখা দিল তখন শুধু জার্মান ক্যাথলিকরা নয়, চেক অভিজাত সম্প্রদায়, বড় বুর্জোয়ারা বিদ্রোহের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এই সময় লুথার মিত্রপক্ষ ত্যাগ করে শত্রুপক্ষে যোগ দেন। কিন্তু টমাস মুয়েনজার ধর্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর মত ছিল ঈশ্বরের রাজত্ব স্বর্গে নয়, এই মর্তেই সৃষ্টি করতে হবে। ঈশ্বরের রাজত্ব সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা ছিল – রাষ্ট্রের সব সম্পত্তি হবে সাধারণের। এর পরেই তাকে গ্রেপ্তার করে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই বিদ্রোহের ফলেই জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে সামন্তব্যবস্থার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। ষোড়শ শতকে জার্মানিতে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের লড়াই – 'আগসবুর্গের' সন্ধি অনুযায়ী স্থির হয়, রাজ্যের রাজা হবে যে সম্প্রদায়ের, সেই রাজ্যের রাজকীয় ধর্ম হবে সেই সম্প্রদায়ের – ল্যাটিন ভাষায় এই নীতি হলো, "Cujus regio ejus religio"

ফ্রান্সে ১৫৬২ থেকে ১৫৯৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলে। ফ্রান্সের, প্রোটেস্ট্যান্টরা 'হিউগিনো' নামে পরিচিত। ১৫৭২ খ্রিঃ ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যবর্তী, নাভারের, প্রোটেস্ট্যান্ট রাজকুমার হেনরী ফ্রান্সের ক্যাথলিক রাজকুমারীকে বিবাহের জন্য নিজেও ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করেন। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে সেন্ট বার্থলোমিউ তিথিতে বহু প্রটেস্ট্যান্ট নর-নারী-শিশুকে মধ্যরাতে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হয়। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা হেনরী 'নান্তের অনুশাসন' (Edict of Nanter) জারি করেন। যার ভিত্তিতে ফ্রান্সের প্রোটেস্ট্যান্টরা পূর্ণ নাগরিকের অধিকার পায়। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে রাজা হেনরী এক ধর্মান্ধ ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান।

ইংলন্ডে টিউবার পরিবার, বুর্জোয়াদের সহযোগিতায় এক একছত্র কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। নবগঠিত জাতীয় গির্জার প্রধান হিসাবে রাজা অষ্টম হেনরী রোমের (পোপের) প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করেন। খ্রিস্টিয় মঠগুলি উঠিয়ে দেন এবং গির্জার অধীনস্ত সব জমি বাজেয়াপ্ত করে রাজার অধিকারে রাখেন না হলে বুর্জোয়াদের কাছে বিক্রি করে দেন। কিন্তু যাজকদের ধর্ম ব্যাখ্যার অধিকার যাতে সম্পূর্ণ লোপ না

পায় সেজন্য ল্যাটিন ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও ছাপা নিষিদ্ধ করেন। কয়েকজন অনুবাদক ও মুদ্রক এবং বিদেশে ছাপা ইংরেজি বাইবেল বিক্রেতা তার আমলে এই অপরাধে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত হন। অষ্টম হেনরীর পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে সরকারি 'প্রার্থনা পুস্তক' প্রকাশিত হয় এবং সমস্ত গির্জায় বাধ্যমতামূলক ব্যবহার শুরু হয়। এরপর তার বৈমাত্রেয় দিদি ক্যাথলিক মেরির নির্দেশে ক্র্যামনার, ল্যাটিমার ও রিডলি –এই তিন প্রোটেস্ট্যান্ট বিশপকে পুড়িয়ে মারা হয়। অষ্টম হেনরির কন্যা এলিজাবেথের সময় সরকারি ধর্মনীতি কঠোর হওয়া সত্ত্বেও বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদ সাধারণের হাতে পৌঁছায়। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে আইন পাশ করা হয় যে, যারা সরকারি ধর্ম মানবে না তাদের কারাদন্ড, নির্বাসন বা মৃত্যুদন্ড হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সরকারি উদ্যোগেই বাইবেলের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সরকারি ধর্মনীতির বিপরীতে যারা দাঁড়ালেন তারা হলেন, 'সরকারি ধর্মের অনানুযায়ী'। সরকারি ধর্মে অনানুযায়ীরা দুটি দলে বিভক্ত ছিল। ১) Congregational দল ২) Presbyterian দল। ইংলন্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে যারা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন – তাদের একযোগে বলা হয় Puritan বা পবিত্রপন্থী।

বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও শাসকশ্রেণী রূপে আত্মপ্রকাশ করার শক্তি অর্জন না করায় ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইংলন্ডে বুর্জোয়া বিকাশের পক্ষে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও টিউবাররা রাজত্ব চালাত সামন্ত নৃপতি হিসাবেই। প্রথম জেমসের সময় ভূমি রাজস্ব কমে আসায় এবং ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজশক্তি ক্রমশ কর বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয় – যার চাপ গিয়ে পরে বুর্জোয়াদের উপর। পার্লামেন্ট মারফত বুর্জোয়ারা তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের প্রস্তাব ভোটে নাকচ করে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে রাজকীয় একচেটিয়া অধিকার ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক দাবি নাকচ হয়। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের নামে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম জেমস অবস্থা বুঝে বললেন, "ধর্মযাজকরা না থাকলে রাজাও থাকবে না।" – পরিণতিতে রাজতন্ত্রের অবসান হলো এবং চার্চও পার্লামেন্টের অধীনে এলো। এই গৃহযুদ্ধে যারা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিল তাদের মধ্যে ডিগাররা অন্যতম। ডিগারদের নেতা উইনস্ট্যানলি বলেছিলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান না করা হলে প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেছিলেন, "এই যে ধর্মীয় নীতি বাণী যাকে তোমরা বল আত্মিক ও স্বর্গীয় বস্তু আসলে তা হচ্ছে চোর ডাকাতের পদ্ধতি যা নিয়ে মনুষ্য জীবনের শান্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্র লন্ডভন্ড করা হয় এবং সদর দরজা দিয়ে যা আসে না, আসে ঘোরা পথ দিয়ে। এই সব মর্মবাণী আসলে হচ্ছে জুয়াচুরি, কারণ সাধারণ মানুষেরা যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গের স্বপ্নে বা নরকের আতঙ্কে মগ্ন থাকে, সেই সুযোগে তাদের চোখের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় যাতে করে তারা তাদের জন্মগত অধিকারগুলি দেখতে না পায় এবং জীবনকালে এই পৃথিবীতে তাদের করণীয় কি তা তারা দেখতে না পারে। এইসব নোংরা স্বপ্নালুতা। এইসব হচ্ছে এমন মেঘ যা থেকে বৃষ্টি হয় না। এইসব ছদ্মবেশী ধর্মযাজকেরা জানে যে এরা যদি এদের ঐশ্বরিক বাণীর মোহে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে মৃত্যুর পরপারে স্বর্গের ঐশ্বর্য ও গৌরবের চিন্তায় বিভোর রাখতে পারে, তাহলে এই পৃথিবীর সবকিছুরই অধিকারী হতে পারবে ধর্ম যাজকরা নিজেরা এবং মোহগ্রস্ত মানুষদের তারা তাদের গোলামে পরিণত করতে পারবে।"

ইংলন্ডে এলিজাবেথ, প্রথম জেমস, প্রথম চার্লসের শাসনকালে পিউরিটানদের রাজদ্রোহী রূপে দেখা হতো। ১৬৪০-১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংলন্ডে গৃহযুদ্ধ ছিল পিউরিটানদের ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ। তারা প্রচলিত ধর্মের জায়গায় নিজেদের ধর্মমত আইনের জোরে বসালেন। সমস্ত গির্জা থেকে অলঙ্করণের উপাদান সরানো হলো। সরকারি যাজকজদের চাকরি গেল, মূর্তি ভাঙ্গা হল। কিন্তু ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস পুনরায় সিংহাসনে বসেন এবং সরকারি ধর্ম ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পিউরিটানদের ধর্ম ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইনটি পোড়ান হয়। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে "ধর্ম পরীক্ষা আইন" বিধিবদ্ধ হয়। এর মূল কথা হলো, সরকারি ধর্ম অনুযায়ী যে ব্যক্তি গির্জায় উপাসনা করে না, সে কোন দায়িত্ব পাবে না, কোন মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য হতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় চার্লসের সময় যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা সামন্ততন্ত্র থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয় চার্লস পার্লামেন্টের মতানুযায়ী রাজত্ব চালাতেন। পরবর্তী সকলেই পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবই ইতিহাসে প্রথম সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে প্রকাশ্যে নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই বিপ্লবেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্ম বর্জিত হয় এবং সর্বপ্রথম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিপ্লবের উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়। এই বিপ্লবে বুর্জোয়ারা রাজা ষোড়শ লুই ও রানী মেরিকে হত্যা করে। অর্থাৎ অলৌকিক জগতের দেবতাদের যিনি দেবতা ইহলোকে তার প্রতিনিধি, 'রাজা'র পার্থিব বিচার ও শাস্তি প্রদান

সম্ভব হলো। গিলোটিনে রাজার শিরচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের অলৌকিক ধারণার মূলচ্ছেদ ঘটল।

ইউরোপে তখন সামন্ত গর্ভে পুঁজির পুনরুৎপাদন (পুঁজি উৎপাদনের চক্র) শুরু হয়েছে। ফলে পুরানো অর্থনীতি ও নতুন অর্থনীতির মধ্যকার দ্বন্দ্বর সামাজিক প্রতিচ্ছবি স্বরূপ ধর্মসংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছে – ভারতে তখন সামন্ত ব্যবস্থার গর্ভে শিখ ধর্মের উদ্ভব ঘটে।

ছ) শিখ ধর্ম প্রসঙ্গে

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক। দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ গুরুমুখী ভাষার উদ্ভাবক। তৃতীয় গুরু অমর দাস জাতিভেদ প্রথা দূর করতে লঙ্গরখানা (সাধারণ ভোজনালয়) স্থাপন করেন। চতুর্থ গুরু রামদাস, রামদাসপুর নগর (অমৃতসর) ও স্বর্ণমন্দির স্থাপন করেন। পঞ্চম শিখ গুরু অর্জন, আদি গ্রন্থ সাহিব গ্রন্থিত করেন। তিনি একই সঙ্গে ধর্মীয় গুরু ও শাসকরূপে আবির্ভূত হন। দশম গুরু গোবিন্দ সিং খালসা পন্থা গড়ে তোলেন – যা এক সামরিক শাসনতন্ত্র। প্রধানত ঔরঙ্গজেবের সময়কালে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন প্রতিরোধ করতেই খালসার উদ্ভব। এই সময় প্রতিটি শিখ পুরুষের জন্য আবশ্যিক হলো পঞ্চ ‘ক’। গুরু গোবিন্দ সিং মনুষ্য গুরু পদ অবলুপ্ত করে, গ্রন্থ সাহিবকে গুরুর আসনে বসান। গ্রন্থসাহিব হলো শিখদের ধর্মগ্রন্থ। শিখ ধর্মমতে ঈশ্বর অবিভাজ্য এবং সবচেয়ে নীতিবান। ঈশ্বর কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির দেবতা নয়, তিনি বিশ্বজনের জীবনদাতা। তাঁর মহিমা বোঝার একমাত্র পথ হলো তাকে বোঝার প্রবল ইচ্ছা। তাঁকে পূজার একমাত্র ক্রিয়া তাঁর গুণগান কীর্তন, তাঁর নাম ধ্যান। শিখ ধর্মে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার কোনো স্থান নেই। মহিলাদের সম্মান প্রদান করা এবং হিন্দুদের সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করা হয়েছে। এই ধর্মে সাংগঠনিক শক্তি দ্বারা মানুষের বাস্তব সেবা করাই প্রধান কাজ। শিখ ধর্মের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ হলো ঃ

১) সংগৎ অর্থাৎ সকলেই সমান। সকলেই সৎভাবে এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে হবে।

২) পংগৎ বা লঙ্গর অর্থাৎ সাধারণ রান্না ঘর, যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

শিখ সমাজ সুগঠিত হয়েছিল প্রতিকূল মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে। সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রাম করে।

হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিখ ধর্মের অভ্যুত্থান সম্পর্কে শিখ ইতিহাস প্রণেতা জোসেফ ডেভি কানিংহামের মতে, “হিন্দুদিগের ধর্ম নবোন্নতি লাভের জন্য পরিবর্তিত হইয়া এক সজীব ভাব ধারণ করিল। রামানন্দ ও গোরক্ষ, ধর্মের সমতা প্রচার করেছিলেন। চৈতন্য সেই সমধর্মাক্রান্ত সম্প্রদায়ের পুনঃসংস্কার সাধন করিলেন। পৌত্তলিক ধর্মের উচ্ছেদ সাধন কল্পে কবীর দেশ প্রচলিত ভাষায় জনসাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন। বল্লভ জগতের সাধারণ কর্তব্য কাজের সহিত সকাম উপাসনার বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমুদয় সদাচারী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ ইহজীবনের নশ্বরত্বে এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন যে, মানবের সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে বলিয়া মনে করেন নাই। বহু দেবার্চনা, ঘোর পৌত্তলিকতা এবং পৌরহিত্য কার্য হইতে মুক্তি লাভ হয় – ইহাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।......

তাহারা জাতি গঠনের বীজ বপন না করিয়া, আপনাপন বিভিন্ন ধর্মমতের পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়গুলি এখনো সেই উপদেশ অনুসারেই কার্য করিয়া থাকে। সমাজ ও ধর্মের এই অবস্থায় নানক ধর্ম সংস্কারের প্রকৃত উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানকের প্রতিষ্ঠিত সেই দৃঢ় ও প্রশস্থ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তদনুবর্তী গোবিন্দ স্বদেশবাসীদিগের মনে জাতীয়তার এক নতুন বহ্নি প্রজ্জলিত করেন। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন – কি জাতি, কি বংশ, কি রাজনৈতিক অধিকার, কি ধর্মমত, সর্ব বিষয়ে উচ্চ ও নিচ সকলেই সমান।”

কিন্তু শিখ ধর্ম প্রবর্তনের সময় ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সাধারণের দুর্বিসহ জীবনের অবসানের কোনো বাস্তব পরিকল্পনা শিখ ধর্মে উল্লেখিত হয়নি।

পুঁজিবাদী সমাজ

ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়াদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রথম পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। সামন্ত প্রভু ও ভূমি দাস প্রতিস্থাপিত হয় পুঁজির মালিক ও মজুরী দাস দ্বারা। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে বুর্জোয়াশ্রেণী জাতিরাষ্ট্র গড়ার মধ্য দিয়ে সামন্তব্যবস্থার অবসান ঘটায়। নির্দিষ্ট ভূখন্ডে দীর্ঘদিন বসবাসকারী, একই অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাসধারী ও একই ভাষা ব্যবহারকারীদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের আওয়াজই জাতিরাষ্ট্র গঠনের সহায়ক ছিল। এই আওয়াজের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের পণ্যের বাজার ঐ রাষ্ট্রের পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে রাখা। রাষ্ট্রের জনগণকে জাতিয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল।

যা অবশ্যই কোন ধর্মের ভিত্তিতে নয়। জাতিরাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক ভিত্তিতে হিন্দুজাতি রাষ্ট্র শুধুমাত্র অলীক কল্পনা নয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির উপাদানও বটে। আধুনিক যুগের প্রাক্কালে একদিকে যেমন ধর্মসংস্কার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি শুরু হয়েছিল রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করার সংগ্রাম। মানুষ ধর্মকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা ও দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সঁপে দেবার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় অর্থনীতির নিয়মে সাধারণের প্রয়োজন, মুনাফাভিত্তিক জোগান ও চাহিদার উপর দাঁড়াল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্ক্রিয় হলেও বিলোপ হয়নি। নতুন সমাজে বঞ্চনার হাহাকার থেকে মুক্তির সহজ মানবিক উপায় হলো দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও পুরানো ধারণ অনুযায়ী ধর্মীয় দর্শনে নিমগ্ন হওয়া। যদিও বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে মানুষের চেতনায় ধর্মের প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পায় তথাপি লোপ পায়নি। ধর্মীয় রীতিনীতি বহুলাংশে সংস্কার করে ধর্মের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে মানুষকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ধর্মীয় দর্শনে আবদ্ধ রাখা হলো।

পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে জাতিরাষ্ট্রগুলি, সামন্ত বাদী রাষ্ট্রগুলিতে নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। এই পর্যায় উৎপাদনের বিকাশ উৎপাদনের লক্ষ্যের সমানুপাতিক থাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পায়। বাষ্পচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হয়। যন্ত্রের ক্রমাগত উন্নতির ফলে সামন্ত গর্ভে সৃষ্ট কর্মশালাগুলি ফ্যাক্টরি শিল্পে রূপান্তরিত হয়। স্টক কোম্পানির আবির্ভাব ঘটে। স্টক কোম্পানিগুলি দ্বারা শিল্প ক্ষেত্রে বিনিযোগের ফলে পর্যায়ক্রমে ইংলন্ড সহ ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্প বিপ্লব ঘটে যায়। এর পরবর্তী পর্যায় আরও বড় বড় প্রোজেক্ট নির্মাণ শুরু হয়। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি সংখ্যায় বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে উৎপাদন। কিন্তু বাজারের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়া পুঁজিবাদ অতি উৎপাদনের সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এই সংকট ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে প্রথম শুরু হয়। এরপর ১৮৪৭-৪৮ সালে গোটা ইউরোপ আমেরিকাতে এই সংকট দেখা দেয়। তৎকালিন অর্থনীতি ভূমন্ডলীয় আকার ধারণ না করায় তা নির্দিষ্ট দেশ, মহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পর্যায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিকশিত হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানি ফোকাট পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের মডেল প্রদর্শন করেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ জীব তথা প্রজাতির উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা – এই বিষয়ে ধর্মীয় অলৌকিক তত্ত্বকে নাস্যাৎ করে দেয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে লুই পাস্তুর প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির তত্ত্বকে খারিজ করেন এবং নির্বীজকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ডায়নামো মেসিন, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিন, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কার শিল্পে জোয়ার এবং পরিবহনে গতি সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সামাজিক সদ-প্রতিবিম্ব, "মুষ্টিমেয়র প্রাচুর্য ও বিপুলের নিঃস্বতা" সমাজে বিভিন্ন চিন্তাধারা রচনা করে। সেন্ট সাইমন, সাঁসিমো, রবার্ট ওয়েনের ন্যায় ভিত্তিক ইউটোপীয় সাম্যবাদী তত্ত্বের প্রচার হয়। রবার্ট ওয়েন স্কটল্যান্ডের নিউ ল্যানার্কে আদর্শ শিল্প নগর গড়ে তোলেন। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স ব্রুক মার্ক অনুরূপ শিল্প নগর গড়ে তোলেন। কার্লমার্কস বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তখন পুঁজি, শ্রম ও উৎপাদনের সামাজিকীকরণ শুরু হয়ে গেছে। ফলে পুঁজিবাদের গর্ভে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভ্রূণ ধারণের লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের পাশাপাশি পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যকার কাঁচামালের উৎস ও বাজার দখল ও নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্ব প্রকট হওয়ায় পুঁজিবাদ অবাধ প্রতিযোগিতার পর্ব থেকে একচেটিয়া পর্বে প্রবেশ করে। যা ছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কার। পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক কোনও পরিবর্তন না হলেও সাম্রাজ্যবাদী রূপ ধারণ করে। ফিন্যান্স পুঁজির উৎপত্তি হয়। পুঁজি রপ্তানির সূচনা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কাঁচামালের উৎস ও বাজার দখলের জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিয়মে পরিণত হয়। এই সময় একদিকে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন এবং অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদের সূচনা হয়। খ্রিস্টিয় মৌলবাদের হাত ধরে ক্রমে ক্রমে ইসলাম, ইহুদী, হিন্দু মৌলবাদের প্রকাশ ঘটতে থাকে। এরই মধ্যে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম মেকানিক্স আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি লফ রিলেটিভিটি আবিষ্কৃত হয়। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) সময় রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অক্টোবর বিপ্লব সফল হয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময় চীন, ভিয়েতনাম, সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে শ্রমিক বিপ্লব সংগঠিত হয়। এই পর্যায় আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্য বিজ্ঞানীদের নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধে হিটলার খ্রিস্টিয় সমাজের প্রতিনিধি না হয়েও, ইহুদী বিদ্বেষের যে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছেন তাতে হাজার হাজার

"আনাফ্রাঙ্ক" অকালে সমাধিস্থ হয়েছেন। বহু বিজ্ঞানীর মত বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জার্মানি থেকে বিতাড়িত হন। জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান বলেছিলেন যে হিটলারের হাতে পরমাণু বোমা তুলে দেবার আগে তিনি আত্মহত্যা করবেন। আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণকারী বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে যুদ্ধে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার না করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তৎকালীন মার্কিন সরকার ম্যান হাটন প্রজেক্টের বিজ্ঞানীদের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে পরমাণু শক্তি ব্যবহার করা হবে। তথাপি, আগ্রাসী রণনীতির জন্য মানব সমাজে পারমাণবিক শক্তির বিভীষিকাময় পরমাণু বোমার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সময় বহু বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্র অপেক্ষা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতিকে অধিক গুরুত্ব দেন। যেমন জোলিও ক্যুরি অধিকৃত প্যারিতে বন্দুক হাতে লড়াইয়ের অংশগ্রহণ করেন। ফরাসী পদার্থবিদ জর্জেস ব্রুহাট, প্যারির মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার ছাত্র রাউসেলকে বাঁচাতে নিজে মৃত্যু বরণ করেন। বিজ্ঞানি হলওয়েক তার আবিষ্কৃত মেশিনগান তাঁর প্রিয় মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে ব্যবহার না হতে দিয়ে নিজে মৃত্যু বরণ করেন। এসব কিছুই প্রমাণ করে যে পুঁজিবাদ - সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে, কারণ মানব সমাজ বিকাশের বিপরীতে এটা কাজ করছে। ক্রমে পুঁজির ভূমন্ডলীয় সংস্থার উদ্ভব ঘটে এবং বিশ্ব অর্থনীতি পুঁজির ভূমন্ডলীয় সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং শিল্পীয় শ্রমিক ও শিল্প কারখানার সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের শিল্পের কারণে নিরাপত্তাহীনতাকে সামনে রেখে শিল্পবিরোধী পরিবেশবাদী আওয়াজ উঠতে শুরু করে। পরিবেশবাদী চিন্তাভাবনার মূল বিষয় হলো – স্থিতিশীল সাম্য – যা বিজ্ঞান বিরোধী, বলা ভাল অপবিজ্ঞান। কারণ পরিবেশের সাম্য গতিশীল। এর থেকেই শিল্প বিরোধী, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিরোধী জনমত গড়ে ওঠে। রাসায়নিক সারের বিপরীতে জৈব সার, ফসিল ফুয়েলের বিপরীতে বায়োফুয়েলের ব্যবহার, প্রভৃতির পক্ষে আওয়াজ ওঠে। কিন্তু এগুলি কোন্ অর্থনীতির নিয়মে উৎপাদন ও বন্টন হবে? অবশ্যই পুঁজিবাধী অর্থনীতির নিয়মে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি কি জনকল্যাণ মূলক? যদি তা হতো, তবে সমাজের স্বার্থেই পরিবেশ রক্ষার দায় সে বহন করত। সুতরাং পরিবেশবাদী চিন্তাকে সাইনবোর্ড স্বরূপ ব্যবহারের মাধ্যমে জনকল্যাণ বিরোধী অর্থনীতির নিয়মটিকে আড়াল করে, ভিন্ন পুঁজিবাদী পণ্যের বাজার সৃষ্টির পাশাপাশি, চির সম্প্রসারণশীল বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ভ্রান্ত দার্শনিক প্রচার শুরু হয়েছে। তথাপি মহাকাশ অভিযান, বিভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি, জীব বিদ্যায় অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ক্লোন পদ্ধতিতে "ডলি" নামক মেষ শাবক সৃষ্টি, কৃত্রিম অঙ্গ উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ওয়েব সার্ভার-কে নির্ভর করে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটেছে। সার্ন-এর লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার মারফৎ বস্তুর ভর প্রদাণকারী হিগ্‌স্ বোসন কণা আবিষ্কৃত হয়েছে। যার ফলে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি ঈশ্বরবাদকে টিকিয়ে রাখতে হিগস বোসন কনাটিকে "ঈশ্বর কণা" রূপে প্রচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। পাশাপাশি বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলিকে পুরানো ধর্মীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নতুন কিছু নয় বলে প্রচার করা হচ্ছে। এসব কিছুই বিজ্ঞানের অনিবার্যতাকে রোখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র, পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের অনিবার্যতাকেই স্বীকার করে।

বিংশশতাব্দীর শেষভাগে ধর্মীয় মৌলবাদের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। দাস ও সামন্তব্যবস্থায় উদ্ভুত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থগুলিতে যে কাহিনী রচিত হয়েছিল এবং যে ভাববাদী দর্শন ও অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ধার্য্য হয়েছিল তা অভ্রান্ত মানাই ছিল সকলের কর্তব্য। তার কোনও রূপ পরিবর্তন করা বা হওয়া সম্ভব নয়। যারা এই বিরোধিতা করবে তাদের রেহাই নেই। যে পুঁজিবাদ ধর্মকে বর্জন করে ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল, অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে ধর্মের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে জনসাধারণকে ধর্মের আওতায় এনেছিল, একচেটিয়া পর্বে, সেই পুঁজিবাদ ধর্মকে "মৌলবাদ" রূপ ধারণ করালো। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে প্রটেস্টান যাজকরা এক ধর্মসম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয় যে বাইবেলের মৌলিক সিদ্ধান্ত (Fundamentals) গুলি অভ্রান্ত এবং তাকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। এরপর থেকে Fundamentalism বা মৌলবাদের জন্ম হয়। এরপর একে একে বিভিন্ন ধর্মের – ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি ইত্যাদি মৌলবাদের জন্ম ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে দেশে দেশে তার বিকাশ হয়।

আফগানিস্তানে, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের পুতুল সরকারকে উৎখাত করতে মার্কিন সিআইএ প্রথমে সৌদী আরবের মাধ্যমে আল কায়দার সৃষ্টি করেছিল। আলকায়দার সাহায্যে, সোভিয়েত পুতুল সরকারকে উচ্ছেদ করে মার্কিন পুতুল সরকার, তালিবান সরকার, প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আলকায়দা মারফৎ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস ও মার্কিন কোম্পানির শিল্প ক্ষেত্রের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে, উক্ত দেশে মার্কিন সরকারের সেনা মোতায়েনের সুযোগ করে নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউস, পেন্টাগন ও নিউ ইয়র্কের জোড়া টাওয়ারে বিমান হানার পরিকল্পনাটি রচনা করেছিল পেন্টাগন। এই ঘটনাকে সামনে রেখে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ উক্ত ঘটনার জন্য আল কায়দাকে দায়ী করে ইসলাম দুনিয়ার বিরুদ্ধে আবার ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুশেড ঘোষণা করেছিলেন। এই ক্রুশেড সমালোচনার মুখে সন্ত্রাসবাদী জিহাদে রূপান্তরিত হয়। আজ প্রমাণ হয়ে গেছে বিভিন্ন পুঁজিগোষ্ঠীগুলি তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করতে – বর্তমান দুনিয়ায় ধর্মীয় মৌলবাদ তথা সন্ত্রাসবাদ-এর জন্মদান ও লালন পালন করে চলেছে। ২০১৪ সালের ১২ই নভেম্বর ইকোনমিক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, "বৃহৎ আন্ত র্জাতিক ব্যাঙ্কগুলি সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করে"।

২০০৯ খ্রিস্টাব্দ শার্লি এবদো পত্রিকায় একটি খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশের প্রতিবাদ করায়, উক্ত রচনার লেখককে বরখাস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এবারে উক্ত পত্রিকায় হজরত মহম্মদের ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশের বিরোধিতায় তা পুনরায় প্রকাশ করা কি উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত নয়? শার্লি এবদো'র বর্তমান ভূমিকা কি ইউরোপে ইসলাম বিরোধী নয়া নাৎসীবাদী অন্দোলনকে মদতদানকারী নয়? বিগত কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকার উত্তর ও পশ্চিমাংশের দেশগুলি থেকে অসংখ্য মানুষ জীবিকা ও আশ্রয়ের জন্য ইউরোপের দেশগুলিতে আসছে। ইউরোপে মুসলিম শরণার্থীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় খ্রিস্টানদের জীবিকা হরণের অভিযোগ এনেছে নয়া নাৎসীবাদীরা। পুঁজিবাদী দুনিয়ার ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যে দুনিয়াকে ভাগাভাগির যুদ্ধে ধর্মীয় মৌলবাদ ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম দিয়ে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় পুঁজিবাদী কারণকে আড়াল করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আল কায়দা, জৈইসএ মহম্মদ প্রভৃতি সংগঠনগুলির নিজস্ব কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই তার জন্ম। কিন্তু 'আই এস' নিছক কোনো মৌলবাদী সংগঠন নয়। ইসলামী মৌলবাদী আদর্শের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর পৃথক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমান রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন জি ২০ বা শীর্ষ ২০টি রাষ্ট্রের একাংশের আই এস-এর পিছনে মদত আছে। আজ প্রতিটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রই উগ্র ধর্মবাদী আচরণ করছে বা ধর্মীয় মৌলবাদকে মদত দিয়ে চলেছে। পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে প্রতিরোধ করতে এই আফিমকেই পুনরায় ব্যবহার করছে দুনিয়ার মালিকশ্রেণী।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মৌলিক পার্থক্য

১) প্রতিটি ধর্মের ভিত্তি হলো এই যে বিশ্ব পরিচালিত হয় একটি অতিপ্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা। জ্ঞানের দ্বারা নয়, বিশ্বাসের দ্বারাই এই শক্তিকে অনুভব করা সম্ভব।

বিজ্ঞান হলো পরীক্ষিত বস্তুগত জ্ঞান। বৈজ্ঞানিক মতে বিশ্বের প্রাকৃতিক বিষয়গুলি পরিচালিত হয় প্রাকৃতিক নিয়মে এবং সামাজিক বিষয়গুলি পরিচালিত হয সামাজিক নিয়মে। সমাজ যেহেতু শ্রেণী বিভক্ত সেহেতু সামাজিক আইনগুলি কর্তৃত্বকারী মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু সমাজ বিকাশের নিয়মগুলি ব্যক্তি ইচ্ছা ও চেতনা নিরপেক্ষ।

২) ধর্মে জীব ও জগতের সৃষ্টি তত্ত্ব রহস্যময়, ধর্মমতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনুকরণেই মানুষ ও জীবের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধর্মের ইতিহাস পর্যায়ক্রমে – ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে মানুষ তার নিজের কল্পনা থেকে 'ঈশ্বরের' জন্মদান করেছে। বিজ্ঞানে জীব ও জগতের সৃষ্টির তত্ত্ব ক্রমবিকাশমান বিবর্তন।

৩) ধর্মে সব কিছুই শাশ্বত, কোনো কিছুই পরিবর্তনীয় নয়। বিজ্ঞানে প্রকৃতি, সমাজ সবকিছুই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন ক্রমবিকাশমান গতিশীল সাম্য ধর্মী – যা হলো বিবর্তনবাদ।

প্রকৃতির নিয়ম – বস্তুগত জ্ঞান, মানুষ যতদূর পর্যন্ত অর্জন করতে পেরেছে, সেই পরিমাণে প্রকৃতিকে **প্রভাবিত** করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

উপসংহার

মানব সমাজেই ধর্মের উদ্ভব ও বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে। ধর্ম ও বিজ্ঞান – দুইই মানুষের সমাজ ও বৈষয়িক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এক অস্থিরময় অবস্থায় – সাধারণের হতাশার মুক্তি, বিবাদের অবসান, অসহায়তার সহায়রূপে আবির্ভূত হলেও কোন ধর্মই কিন্তু সামাজিক অস্থিরতার প্রধান কারণ যে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা

তা সাধারণের সামনে প্রকাশ করেনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রকৃতির নিয়ম অজানা থাকায় প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন অলৌকিক জগতের কল্পনা করা হয়েছিল প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মূলতত্ত্বে সামাজিক বৈষম্যের কারণ হেতু অর্থাৎ সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য অলৌকিক জগতের তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে। ফলে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মালিক শ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য যে শোষণমূলক উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে তা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রচার বাণী দ্বারা সাধারণের নজর থেকে আড়াল করা হয়েছে। ধর্ম বরঞ্চ সমাজে বিদ্যমান শাসকশ্রেণী অথবা উদীয়মান বণিক শ্রেণীর স্বার্থে অর্থনৈতিক সংস্কারের পক্ষে অথবা নতুন অর্থনীতি লাগু করার পক্ষে সাংস্কৃতিকভাবে জনমত গঠন করেছে। বিবদমান দুই শাসক গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বও ধর্মের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম শ্রেণী বিভক্ত মানব সমাজকে বহুধা বিভক্ত করে। একদিকে যেমন শ্রমজীবী জনগণের একতা নষ্ট করেছে, অন্য দিকে তেমনি মালিক শ্রেণীর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে শ্রমজীবী জনতাকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছে। ধর্ম মূলত শাসকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করেছে এবং করছে। এই সব কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান ধর্মীয় দর্শনের বিপরীতমুখী হওয়ায়, চিরকাল ধর্মের কান্ডারীরা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছে। সমাজে প্রচলিত ধারণা নির্দ্বিধায় মেনে না নিয়ে সঠিক বেঠিক বিচারের প্রবৃত্তি থেকে দর্শনের উদ্ভব। যাঁরা এই কাজে প্রবৃত্ত ছিলেন তারাই দার্শনিক। যে দার্শনিকরা প্রচলিত ধারণার উৎস ব্যতিরেকে যুক্তির ভিত্তিতে সঠিক বেঠিক বিচার করতেন – তাঁরা হলেন যুক্তিবাদী এবং তাদের প্রযুক্ত পদ্ধতি হল যুক্তিবাদ। বিপরীতে যারা প্রচলিত ধারণাগুলির উৎস অনুসন্ধান এবং প্রকৃতির নিয়মগুলি জানার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন – তারাই হলেন বিজ্ঞানী এবং তাদের সিদ্ধান্ত হল বৈজ্ঞানিক মতবাদ। রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী ও ধর্মের কান্ডারিদের স্বার্থ যখন কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ দ্বারা বিঘ্নিত হয়েছে বা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন ঐ সব দার্শনিক বা বিজ্ঞানীকে নির্দ্বিধায় বন্দি ও হত্যা করা হয়েছে। সক্রেটিসের হেমলক বিষ পানে মৃত্যু, ব্রুনোর জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু, গ্যালিলিওর দীর্ঘদিন অন্ধকার কারাবাসে অন্ধ হয়ে মৃত্যু – তারই উদাহরণ। দাস ও সামন্তব্যবস্থায় বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা গোপনে, চাঁদের আলোয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন – এই কারণে ঐ সময় বিজ্ঞানীদের **ল্যুনাটিক** বলা হত। এমনকি সমাজে প্রচলিত রীতির বিপরীতে সুফল পাওয়ার পরেও যদি দেখা যেত যে ধর্মীয় ধারণায় অবিশ্বাস জন্মানোর মত কোনো সত্য প্রকাশ পেতে পারে তবে প্রচলিত রীতিকে অটুট রাখতে, রীতি লঙ্ঘনকারীকে যেনতেন প্রকারে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হতো। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ফ্রান্সের জোহান অফ আর্ক-এর জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার ঘটনা।

পুঁজিবাদের সূচনাকালে – পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। তাই ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রজাতি তথা মানুষের উৎপত্তির ধর্মীয় ধারণাকে নস্যাৎ করলেও, এই কারণে তার জীবনহানি হয়নি। তথাপি গীর্জা তার মতবাদের বিরোধিতা করেছিল এবং ডারউইন নিজে যে নাস্তিক ছিলেন তা সেসময় সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে পারেননি। আবার ফ্রান্সে বিপ্লবের পূর্বে কর আদায়কারী কোম্পানি, "জেনারেল ফার্ম"-এ অংশীদার থাকার কারণে, আন্তোনি লরেঁ ল্যাভয়সিয়ার-এর মত বিজ্ঞানীকে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ বিপ্লবী সরকার গিলোটিনে হত্যা করে। এই প্রসঙ্গে ফরাসী বিজ্ঞানী যোশেফ লুই ল্যাগ্রাঞ্জের বলেছিলেন, "মাথাটা কাটতে তাদের এক মুহূর্ত লেগেছে, অথচ একশ বছরে হয়তো এমন একটা মাথা তৈরী হবে না।"

পুঁজিবাদ একচেটিয়া পর্বে প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, "বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন" ও ধর্মীয় মৌলবাদের সূচনা হয়। সুতরায় যে পুঁজিবাদ ধর্মকে নাকচ করেই আবির্ভূত হয়েছিল, সেই পুঁজিবাদই একচেটিয়া পর্বে ধর্মকে অঙ্গীভূত করে নেয়। রাষ্ট্রের আইনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দান – কর মুক্ত করা, যা ধনীক শ্রেণী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করে। বহু ক্ষেত্রে শিল্পপতিরাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। একচেটিয়া পর্বে ক্রমাগত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎপাদন বিকাশ যে মাত্রায় পৌঁছেছে তা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বন্টনের সীমাবদ্ধতাকে চূর্ণ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হতে চায়। যা পুঁজিবাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে। তাই পুঁজিপতিরা বহু সংস্কারের মধ্য দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। এমতাবস্থায় ধর্মের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ধর্মের কান্ডারী ও পুঁজিপতিরা একে অপরের সাহচর্যে এসে অস্তিত্ব রক্ষার যৌথ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ধর্ম ও পুঁজিবাদ মিথোজীবীতা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। যার অর্থ বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, কোনটাই পৃথকভাবে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম নয়।

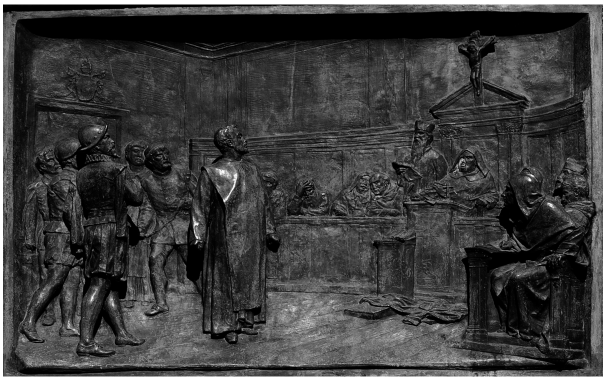

ব্রুণোর বিচার

ব্রুণোকে জীবন্ত দগ্ধ করার মর্মর চিত্র

গ্যালিলিওর বিচার

বর্তমানে যে ভূমন্ডলীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা রাষ্ট্রের সীমানা ভেঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বস্তুত কর্মসংস্থানের জন্য, শিক্ষার্জনের জন্য, চিকিৎসার জন্য, বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বিশ্বব্যাপী, শিক্ষিত-অর্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী থেকে গরীব, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষকেই দেশের সীমারেখা পার করতে হচ্ছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজে "কালাপানি" পার না হওয়ার নীতি বর্জিত হয়েছে। বর্তমানে এমন একটা রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না যেখানে শুধুমাত্র একটি মাত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনতা বিদ্যমান। সামাজিক বিষয়ে যে সামাজিকীকরণ ঘটেছে তা

কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নীতি দ্বারা অবরুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এমন একটা অবস্থায় বিশ্বে কোন ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র থাকা সম্ভব কী? নাকি ধর্ম ভিত্তিক কোন রাষ্ট্র থাকা উচিত? কেননা কোন এই বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেই তা ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলবেই – যা কাম্য নয়। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝানো হয় রাষ্ট্র সমস্ত ধর্মকেই সমান অধিকার দেবে এবং সমস্ত ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতা করবে। বাস্তবত এইরূপ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রের মধ্যে মিল হলো – ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে শাসকশ্রেণীর স্বার্থে, শাসকশ্রেণীর উস্কানিতেই সংঘটিত হয় এবং সাধারণ জনগণের কাছে তা কাঙ্ক্ষিত নয় তা বলাই বাহুল্য। সাধারণের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসই তার প্রমাণ। সুতরাং **ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ব্যক্তিগত বিষয়রূপে গণ্য করা উচিত।**

সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক নিয়মে, বর্তমান উৎপাদনের বিকাশ ও ভূমন্ডলীয় অর্থনীতি, আগামীতে জাতিয়তাবাদের উর্ধ্বে আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থায় শ্রেণীহীন সমগ্র মানবজাতির ধর্ম – "মানবিকতা"র সূর্যোদয় আসন্ন। ■

নিবন্ধ রচনায় যে পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

১) ভারতীয় দর্শন – দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
২) ধর্ম প্রসঙ্গে – সুকুমার সিং।
৩) রূপান্তরিত ইউরোপ – রিলা মুখোপাধ্যায়।
৪) ধর্ম ও সমাজ – জর্জ টমসন।
৫) Hinduism – David Frawley
৬) ধর্ম প্রসঙ্গে – মার্কস-এঙ্গেলস।
৭) মুসলমান সমাজে সংস্কার – গিয়াসউদ্দীন।
৮) এক হিন্দু আত্মপরিচয়ের খোঁজে – দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা।
৯) ইসলাম ধর্মের রূপকথা – রাহুল সংকৃত্যায়ণ।
১০) মার্কসবাদ সৃজীনশীল বিজ্ঞান – আন্দোলনের সাথীর পাঠক উদ্যোগে প্রকাশিত।
১১) আন্দোলনের সাথী – ২০১৪-১৫ সালের বিভিন্ন সংখ্যা

ধর্ম প্রসঙ্গে

জর্জ টমসন – "ধর্মের মতো বিজ্ঞানের জন্ম এই ইন্দ্রজাল থেকে। কিন্তু ধর্ম বাড়িয়ে তুলল নেতিবাচক দিকটাই – অজ্ঞাতের সামনে মানুষের অক্ষমতার প্রকাশ হলো ধর্ম বিশ্বাস। ঠিক অপর দিকে তেমনি বিজ্ঞান ইন্দ্রজালের ইতিবাচক দিকটাকেই বিকশিত করল – যা কিছু জানা গেছে তার উপর মানুষের ক্ষমতার প্রকাশ হলো বিজ্ঞানে। মানুষের চিন্তাধারায় অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে এই দুই ধারণা অভিন্নভাবেই ছিল। আদি বিজ্ঞানীরা ছিলেন সবাই ধর্মযাজক – তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঐন্দ্রজালিক চিন্তাধারাতেই আচ্ছন্ন ছিল।"

কার্ল মার্কস – "ধর্মীয় দুঃখকষ্ট হচ্ছে একদিকে প্রকৃত দুঃখকষ্টেরই প্রকাশ, অন্যদিকে সেই বাস্তব দুঃখ কষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও বটে। ধর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন দুনিয়ার করুণার কথা এবং ভৌতিক জীবনে আত্মার মোহ হচ্ছে ধর্ম। মানুষের জীবনে ধর্ম হচ্ছে আফিম।"

জর্জ টমসন – "বুর্জোয়ারা আমাদের ধর্মের শত্রু বলে নিন্দ করে। আমরা সেই পরিমাণে ধর্মের শত্রু ঠিকই, যে পরিমাণে বুর্জোয়ারা জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে; এবং আমরা বিশ্বাস করি যে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান হলে মানুষ ধর্মের প্রয়োজন কাটিয়ে উঠবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষ তা করেছে, কিন্তু আমরা ধর্মের পূজা অর্চনার স্বাধীনতা সব সময়েই সমর্থন করি।

স্টিফেন হকিংস – "যারা অন্ধকার ভয় পায় তারাই বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস করে। আমি অন্ধকারকে ভয় পাই না।"

জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান ঃ

ডিম আগে না মুরগী আগে?

"ডিম আগে না মুরগী আগে" – বহু চর্চিত এই জিজ্ঞাসার ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায় বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের বক্তব্যে (খ্রিস্ট পূর্ব ৩৮৪-৩২২)। তিনি বলেছিলেন যে ডিম থেকে পাখি বা পাখি থেকে ডিম যেটাই হোক – এটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। যেহেতু বাবা-মা ছাড়া সন্তানের জন্ম হতে পারে না, আবার সন্তানেরা বড় হয়েই বাবা-মা হয় – তাই পুরো বিষয়টা নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে প্লেটো বলেছিলেন, প্রত্যেক বস্তু প্রকৃতিতে আসার আগে আত্ম অবস্থায় থাকে। দার্শনিক প্লুটার্ক-ই একটি দার্শনিক সম্মেলনে প্রথম এই বিষয়টি উত্থাপন করেন। ফলে দার্শনক মহলে এই সমস্যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ পেতে শুরু করে। যেমন সুল্লা বলেন, পৃথিবী ও প্রাণ সৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যেই এর উত্তর পাওয়া যাবে।

স্টিফেন হকিং ও ল্যাঙ্গার-এর মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মতে "ডিম"ই আগে এসেছে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে রয় এ সোরেনসেন এক প্রবন্ধে সহজ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তুলে ধরেন যে ডিম থেকেই মুরগীর সৃষ্টি।

জীব বিবর্তনের ধারায় মিউটেশ, প্রাকৃতিক নির্বাচন, জনন, বংশগতি ও জেনিটিক্যাল ড্রিফটের মাধ্যমে এক গণ থেকে নতুন গণ, এক প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতি বা উপপ্রজাতির উৎপত্তি হয়। এক গণ থেকে নতুন গণ বা এক প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতি বা উপপ্রজাতি রূপান্তরের মধ্যবর্তী পর্যায়ের জীবেরা স্বাভাবিকভাবেই অবলুপ্ত হয়। এদের মিসিং লিঙ্ক বলা হয়। যেমন সরীসৃপ ও পাখির মধ্যকার মিসিংলিঙ্ক স্বরূপ আর্কিওপটেরিক্সের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

মাছ → উভচর → সরিসৃপ
(৫৩ কোটি বছর আগে) **(৩৭ কোটি বছর আগে)** **(৩০ কোটি বছর আগে)**
↓
পাখি (১৯.৫ কোটি) স্তন্যপায়ী (২১.৫ কোটি)

প্রকৃতপক্ষে মিউটেশন হলো ডিএনএ অণুর বেস-পেয়ারের সজ্জার পরিবর্তন। মিউটেশনে আবার ক্রোমোজোমেরও পরিবর্তন হতে পারে। যদি দেহ কোষে মিউটেশন ঘটে তবে তা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু যদি জনন কোষে মিউটেশন হয় তবে তা পরবর্তী প্রজন্মের দেহকোষ ও জনন কোষ উভয় কোষেই পৌঁছায়। তাই জনন কোষে মিউটেশনই নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। বিজ্ঞানী ডবঝিনস্কির মতে বিবর্তন হলো ধারাবাহিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিউটেশনের পুঞ্জিভূত ফল। সুতরাং একটি প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতি বা উপপ্রজাতি সৃষ্টি হলো দীর্ঘ ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফল। কিন্তু প্রতিটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। চোখে পরার মত পরিবর্তনটা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ এবং তা উক্ত জীবনচক্রের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।

শ্রেণী → গণ → প্রজাতি → উপপ্রজাতি
(Class) (Genus) (Species) (Subspecies)

মুরগীর বিজ্ঞান সম্মত নাম হলো ঃ
Gallus gallus domesticus

মুরগী হলো গ্যালাস গ্যালাস প্রজাতির একটি উপপ্রজাতি, যার পূর্ব পুরুষ হল রেড জাঙ্গল ফাউল (Red gungle foul)। মানব সভ্যতায় পশুপালন পদ্ধতিতে গৃহপালিত হওয়ার কারণে মানুষই এদের বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে। এই পদ্ধতিতে রেড গাঞ্জল ফাউল এবং গ্রে জাঙ্গল ফাউল (Gray gungle foul) দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যেও জনন সম্ভব হয়েছে। বর্তমন মুরগীর বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্য রেড জাঙ্গল ফাউল-এর দেখা গেলেও গ্রে জাঙ্গল ফাউল-এরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই উপপ্রজাতির আবার বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট বিভিন্ন পরিবেশে ছড়িয়ে আছে।

বিবর্তনের ধারাবাহিকতায়, মুরগী হওয়ার আগে যে ডিমটি ছিল তা মুরগী নামক প্রাণীটির নয় – অন্য প্রজাতির – যে উপ প্রজাতিটি থেকে পরিবর্তিত হয়ে মুরগী সৃষ্টি হলো। এবার এই

মুরগী তার উপপ্রজাতিটির অস্তিত্ব রক্ষা করতে যে ডিমগুলি পাড়ল সেগুলি হলো মুরগীর ডিম। সুতরাং মুরগী ও মুরগীর

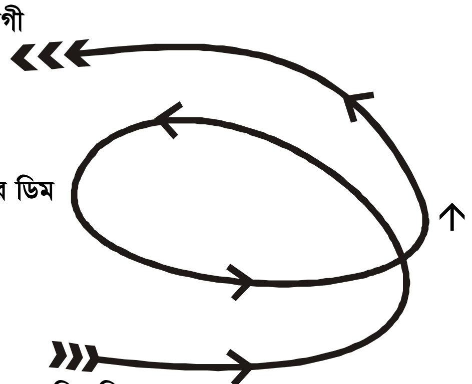

ডিম – এদের মধ্যে মুরগী আগে, মুরগীর ডিম পরে। কিন্তু এটা হলো অধিবিদ্যক চিন্তা।

আবার মুরগী হওয়ার ঠিক আগের স্তরের উপপ্রজাতিটি পরিবেশের কারণে আরও এমন কিছু পরিবর্তন ঘটালো – কেবলমাত্র তখনই তাকে মুরগী বলা চলে। পরিবেশের কারণে মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টির ঘটনা বিরল। তথাপি এক্ষেত্রেও মুরগী আগে, মুরগীর ডিম পরে। বাস্তবে এর সম্ভাবনা ১০%-এরও কম।

একটি উপপ্রজাতি থেকে অন্য উপপ্রজাতিতে রূপান্তরের সম্পূর্ণ পর্যায় ধরে ব্যাখ্যা করলে বা দেখা যায়, মুরগী উপপ্রজাতিতে পৌছানোর ঠিক আগের পর্যায়ে যে প্রাণীটি আছে সেই প্রাণীটি যে ডিম পাড়ে সেই ডিমটির মধ্যেই মুরগী হওয়ার পরিবর্তনটা ঘটে গেছে। এই রূপ ডিম থেকে যখন প্রাণীটি জন্মায় তখন সেই বিশেষ পরিবর্তন নিয়েই সে জন্মায়, যেই পরিবর্তনটার জন্যই সেই প্রাণীটি মুরগী। সুতরাং এই নীরিখে বিচার করলে ডিম আগে – কারণ মুরগী হওয়ার সমস্ত শর্তই ঐ ডিমের মধ্যে নিহিত ছিল। প্রকৃতিতে এই ঘটনার সম্ভাবনা ৯০%। আধুনিক জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজি এই ব্যাখ্যাই দিয়েছে।

যে কোনও প্রাণীর ক্ষেত্রে – এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। যারা জীব বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানেন না তাদের কাছে এ বিষয়ে ধন্দ থাকাই স্বাভাবিক। আসলে এই সমস্যাটি দুটি ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত – ১) প্রজাতির উৎপত্তি এবং ২) প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা। আমরা সাধারণত অভিজ্ঞতায় এর উত্তর – মুরগী তথা নির্দিষ্ট জীবটির জীবন চক্রের মধ্যেই খুঁজতে চাই। বাদ পরে যায় প্রজাতির উৎপত্তির দিকটা – এখানেই উত্তর খোঁজার পদ্ধতিটা হয়ে পরে অধিবিদ্যক। আরও একটা সমস্যা হলো জীবের জীবন-চক্র, সম্পূর্ণ রূপে বৃত্তাকার নয় বরঞ্চ অতি নগণ্য হলেও স্পাইরাল। অর্থাৎ প্রতি প্রজন্মেই অতি নগণ্য হলেও একটা পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

অ্যারিস্টটলের সময়, ডারউইনের বিবর্তনবাদ আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে ঐ সময় এই সমস্যার সমাধানের বিষয়ে ধন্দ সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ডবঝিনস্কির জেনেটিক্যাল অভিব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, "ডিম আগে না মুরগী আগে" এই ধন্দ টিঁকে থাকার কোনো অবকাশ নেই। তথাপি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বস্তরেই এই ধন্দ বিরাজমান। এর কারণ কি?

সমাজে আজও বেশিরভাগ মানুষ পরিবারিকভাবে বংশ পরম্পরায় ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায় বিশ্বাস করে। প্রায় প্রতিটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থে ও পুরাণে পাওয়া যায় যে ঈশ্বরই সমস্ত জীবের সৃষ্টি-কর্তা এবং প্রতিটি প্রাণীর বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্ট এক জোড়া করে জীব পৃথিবীতে তিনিই পাঠিয়েছেন। যেমন সমগ্র মানব জাতীর প্রথম পুরুষ ও প্রথম নারী হলো আদম ও ইভ। এই নীরিখে বিচার করলে মুরগীই আগে ডিম পরে। প্রথম মুরগী এল কোথা থেকে? ঈশ্বর পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়টি ধর্মীয় ভাবনায় খারিজ করা হয়েছে। সুতরাং ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যেই অধিবিদ্যক চিন্তার বীজ লুকিয়ে আছে।

সূর্য কেন্দ্রীর বিশ্ব প্রমাণ হওয়ার পরেও তা সাধারণের কাছে পৌছাতে – গ্যালিলিও, ব্রুনো কে আত্মহুতি দিতে হয়েছিল। আজ সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের অন্তরায়গুলি নির্মূল করলে –"ব্রুনো" দের এগিয়ে আসতে হবে।■

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ঃ

নিউট্রিনো গবেষণায় নবতম সংযোজন 'ইনো'

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছে কোটি কোটি নিউট্রিনো। তাদের ভেদন ক্ষমতা এমনই যে সব কিছুর মধ্য দিয়েই তারা অনায়াসে ছুটে বেড়াতে পারে। প্রতি সেকেন্ডে আমার-আপনার দেহ ভেদ করে যাচ্ছে এরূপ প্রায় ২০০,০০০,০০০,০০০টি নিউট্রিনো; অথচ আমাদের শরীরে কোনো প্রভাব (ক্ষতিকর) ফেলছে না। বলতে পারেন আমরা নিউট্রিনো সাগরে বাস করছি। সংখ্যার দিক থেকে আলোর কণা ফোটন সংখ্যার পরই নিউট্রিনোর স্থান। এই নিউট্রিনো নিয়ে বিজ্ঞানীদের তাই রহস্যের/উৎসাহের অন্ত নেই। কি এই নিউট্রিনো?

১৯৩০ সালে অস্ট্রিয়ার পদার্থবিদ উলফগ্যাং পাউলি প্রথম এই কণার কথা জানান। কিছুতেই শক্তির হিসেব মিলছিল না বিশেষ এক ধরণের তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ায়। পাউলি বললেন – এক নতুন জাতের কণার অস্তিত্ব কল্পনা করলে শক্তির এই গরমিলের সমাধান হতে পারে। তবে এই কণার হদিশ তিনি দিতে পারেন নি। ১৯৫৬ সালে দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক রেনস এবং ক্লাইড কাওয়ান নিউট্রিনোর অস্তিত্বের প্রমাণ পেলেন। যদিও নিউট্রিনোর চরিত্র সম্পর্কে বেশি কিছু বলা যায়নি।

ব্রহ্মান্ড জুড়ে এই যে নিউট্রিনোর অদৃশ্য মেলা – কোথা থেকে আসে এই নিউট্রিনো? সূর্যের অন্দরে অনবরত ঘটে চলছে নিউক্লিয় বিক্রিয়া; সেখানে হাইড্রোজেন বনে যাচ্ছে হিলিয়াম; আমরা পাচ্ছি আলো ও তাপ; এখানেই উৎপন্ন হচ্ছে নিউট্রিনো। অন্যান্য তারকার ক্ষেত্রেও তাই। এছাড়াও ব্রহ্মাণ্ডে সুপারনোভা বিস্ফোরণ, পরমাণু গবেষণাগারে অ্যাক্সিলারেটর প্রভৃতি থেকে অনর্গল এই কণা নির্গত হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত জানা গেছে – নিউট্রিনো তিনটি জাতের হয়। টাউ নিউট্রিনো, ইলেকট্রন নিউট্রিনো এবং মিউওন নিউট্রিনো। সূর্য বা তারকা থেকে উৎপন্ন হয় ইলেকট্রন নিউট্রিনো। আর তা প্রায় আলোর বেগে পৃথিবীতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুই-তৃতীয়াংশই গায়েব হয়ে যায়। কারণ চলার পথে নিয়ত তার জাত পরিবর্তন করে।

কণা পদার্থবিদ্যায় এই জাত পরিবর্তন তো তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের ভর আছে। অথচ কণা পদার্থবিদ্যায় আজ পর্যন্ত সফলতম তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত যে "স্ট্যান্ডার্ড মডেল" – তা বলে আসছিলো – নিউট্রিনো ভরহীন; আলোর কণা ফোটনের মতই। তাই "স্ট্যান্ডার্ড মডেল"-কে আবার কাটা ছেঁড়া করবার পালা। বিজ্ঞানের ধর্মই তাই। পরম সত্য বলে বিজ্ঞান কোনো কিছুকে স্বীকার করে না। নিত্য নতুন গবেষণার মধ্য দিয়ে অধিকতর সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানোতেই বিজ্ঞানের যাত্রা।

আর এই যাত্রায় নবতম সংযোজন হতে চলেছে যার নাম – 'ইন্ডিয়া-বেসড নিউট্রিনো অবজারভেটরি (ইনো)। ভারত সরকারের দ্বাদশতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে 'ইনো' প্রকল্পটিতে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটোমিক এনার্জি এবং ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি যৌথভাবে ১৩৫০ কোটি টাকা লগ্নি করবে। টাটা ইন্সটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, মুম্বাই-এর আমন্ত্রণে বর্তমানে ছাব্বিশটি ইনস্টিটিউশন এবং শতাধিক বিজ্ঞানী এই প্রকল্পের সহযোগিতায় রয়েছে। বাস্তবায়িত হবার পরে এটিই হবে ভারতের সর্ববৃহৎ মৌলিক গবেষণা প্রকল্প।

এই নিউট্রিনো ল্যাবরেটরিটি আপাতত মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে পৃথিবীর আবহমন্ডলে তৈরি হওয়া নিউট্রিনো পর্যবেক্ষণ করবে। আর এ কাজের জন্য বসানো হবে অতি সংবেদনশীল শনাক্তকারী যন্ত্র ম্যাগনেটাইস্‌ড আয়রন ক্যালোরিমিটার ডিটেক্টর (আই সি এ এল)। এটি একটি নিশ্চল যন্ত্র। টেলিস্কোপ যেরূপে দৃশ্যমান আলোর সাহায্যে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে 'আই সি এ এল'ও ঠিক তেমনি নিউট্রিনোর সাহায্যে মহাজগৎ পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

একটি মজার ব্যাপার হল – আয়রন ক্যালোরিমিটার কিন্তু সরাসরি নিউট্রিনো পর্যবেক্ষণ করতে পারবে না। মহাজাগতিক রশ্মির ইন্টার‍্যাকশনে আবহমন্ডলে নিউট্রিনোর সাথে এন্টি-নিউট্রিনোও তৈরি হয়। এবং তারা বিভিন্ন জাতের। পরমাণু-কেন্দ্রের সাথে চার্জ-কারেন্ট ইন্টার‍্যাকশনে নিউট্রিনো তৈরি করে লেপ্টন (ঋণাত্মক আধান-কণা ইলেকট্রন এবং মিউওন) এবং অ্যান্টি নিউট্রিনো তৈরি করে অ্যান্টি-লেপ্টন (ধনাত্মক আধান-কণা পজিট্রন এবং মিউপ্লাস)। নিউট্রিনো বা অ্যান্টি নিউট্রিনো নিস্তড়িৎ হলেও এরা কিন্তু আধান-কণা। 'আই সি এ এল' এই আধান-কণা ট্রাক (track) করেই নিউট্রিনো ও অ্যান্টি-নিউট্রিনো ইন্টার‍্যাকশন আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে।

আয়রন ক্যালোরিমিটার এরূপ একটি ডিটেক্টর যেটিতে লোহার পাত অনুভূমিকভাবে পর পর সাজানো থাকে। দুটি পাতের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলিতে রেজিস্টিভ প্লেট চেম্বার বসানো থাকে। এখান থেকে আধান কনা অতিক্রম করবার সময়ই রেজিস্টিভ প্লেট চেম্বার তাকে ট্রিগার (trigger) করে। এভাবে মূল যে নিউট্রিনো ইন্টার‍্যাকশনটি ঘটিয়েছে তার গতিপথের দিক ও শক্তি নির্ণয় করা হয়। তাছাড়া লোহার পাতকে ঘিরে তড়িৎবাহী তার পেঁচানো থাকে যা একটি সলিনয়েডের আচরণ করে। এতে ডিটেক্টরের মধ্যে একটি সুষম চুম্বক-ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই চুম্বক ক্ষেত্রে আধান-কণা স্বাভাবিক নিয়মেই বেঁকে যায়। বিপরীত আধান বিপরীত দিকে বাঁকে। এটা শুধু ইন্টার‍্যাকশনে নির্গত কণার আধানের প্রকৃতি নির্দেশ করবে না, কণার শক্তি এবং ভরবেগেরও সঠিক পরিমাপ নির্দেশ করার। এই আধান কণাকে ট্রাক করেই পৌঁছে যাওয়া যাবে মূল নিউট্রিনোর কাছে।

আর এই আকর্ষণীয় প্রকল্পটির (ইনো) জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে তামিলনাড়ুর মাদুরাই শহর থেকে প্রায় ১১০ কিলোমিটার দূরে থেনি জেলার পশ্চিম বোড়ি পাহাড়ের তলদেশকে। পাহাড়ের এক কিলোমিটার গভীরে ৩৪৩২ বর্গমিটার অঞ্চল জুড়ে থাকবে ৩২.৫ মিটার উচ্চতার একটি বৃহৎ ল্যাবরেটরি। তাছাড়াও ছোট মাপের তিনটি ল্যাবরেটরি; প্রতিটি ১৬০০ বর্গমিটার এবং ১০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। আর সুড়ঙ্গ কেটে যে টানেলটি তৈরি হবে তার দৈর্ঘ্য ২৪৯১ মিটার।

কিন্তু পাহাড়ের তলায় ভূগর্ভে এই সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কারণ কি? সূর্যের আলোয় নিউট্রিনোর সঙ্গে অন্যান্য কণাও চলে আসে। সেগুলি যাতে টানেলে ঢুকতে না পারে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনকে যথাসম্ভব আটকানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে পাথর নিউট্রিনো ছাড়া অন্য কণা শুষে নেবে। ফলে পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটবে না। এছাড়াও এই অঞ্চলকে বেছে নেওয়ার পিছনে ভূতাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। এই অঞ্চলের ভূ-গঠন এমন যে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নেই। পাথরের প্রকৃতিও এমন যে বৃহৎ নির্মাণ কাজের জন্য উপযোগী।

কিন্তু প্রকল্পটি রূপায়ণের পথ মোটেই মসৃণ হয় নি। বিভিন্ন মহল থেকে বাধা আসছে ক্রমশ। বহু বছর ধরেই এটা চলছে। তার মধ্যে রয়েছেন সমাজকর্মী বলে খ্যাত মেধা পাটেকারও। সম্প্রতি তিনি এম ডি এম কে নেতা ভাইকো'র সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এই প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। প্রেস বৈঠক ও পথে নেমে প্রচার, কোনো কিছুই বাদ যায়নি। বিরোধিতা এই মর্মে যে – 'ইনো' পরিবেশের উপর তীব্র ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। স্থানীয় বাসিন্দারা এর বিকিরণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। মুল্লাইপেরিয়ার এবং ইডুক্কি বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এলাকা শুষ্ক হয়ে যাবে। পাহাড় এবং বনসম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হবে। আরও অভিযোগ এই সুবিশাল সুড়ঙ্গ তৈরি করতে ব্যবহৃত বিস্ফোরক পরিবেশের ক্ষতি করবে। সর্বোপরি ভারতের জন্য এটা কোন লাভ বয়ে আনবে না। কিছু রাজ্য ও রাজনৈতিক মহল এই বিরোধিতায় সামিল হয়েছে। এমন অভিযোগও উঠেছে – যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে সাহায্য করতে এই প্রকল্প ব্যবহার হবে না তো?

কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা কিন্তু বিভিন্ন মহলকে অভিযোগকারীদের ডেকে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। তারা আশ্বস্ত করেছেন – এই প্রকল্প থেকে কোনো তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা বিষক্রিয়ার ফলাফল থাকবে না। ফলে পরিবেশ এবং আঞ্চলিক বাসিন্দাদের ক্ষতির প্রশ্নই ওঠে না। টানেলটা কিছুটা যেতেই পাহাড়ের তলায় ঢুকে যাবে। নির্মাণ কার্যে সারফেস এরিয়ায় এর তেমন কোন প্রভাব থাকবে না। এবং যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে সাহায্যের জন্য 'ইনো'কে কোনোভাবেই ব্যবহার করা হবে না।

আর 'ইনো' থেকে ভারতের লাভ লোকসান প্রসঙ্গে বলতে হয়, শুধু ভারত কেন এরকম বিজ্ঞান গবেষণা দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্য আশীর্বাদ/কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। সময়ের চাকাকেও এগিয়ে দেয়। সমাজকে বিজ্ঞানের সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হাতিয়ার হিসেবেকাজ করে। একথা ভুললে চলবে না যে, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি – প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। তাই 'ইনো' বাস্তবায়িত হলে শুধু বিজ্ঞানে উৎসাহী স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা এবং বিজ্ঞান গবেষকরাই বিশেষভাবে উপকৃত হবেন তাই নয়, গোটা মানব সমাজই উপকৃত হবে।

বিজ্ঞানীদের সামনেও অনেক অজানা প্রশ্নের রূদ্ধদ্বার খুলে যাবে। এই যেমন – নিউট্রিনো ভর পায় কোথা থেকে? সব কিছু ভেদ করে যাওয়ার এই ভুতুড়ে স্বভাবই বা কেন? সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন চিহ্ন – 'বিগ ব্যাং'-এর পরে যে ম্যাটার ও অ্যান্টিম্যাটার তৈরি হয়, পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় দুটোই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা; তাহলে ম্যাটার বা পদার্থ দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হল কি করে? নিউট্রিনোর চরিত্রের মধ্যে হয়ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এই রহস্যও লুকিয়ে আছে। তাই বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ এরূপ গবেষণাকে সর্বদা কুর্নিশ জানায়। ■

সংবাদ দর্পণ

দুধে ভেজাল

দুধ একটি সম্পূর্ণ আহার। এর কারণ হল দুধে মানব শরীরকে বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান সঠিক মাত্রায় উপস্থিত থাকে। আর এই কারণেই শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরনের জন্য পুষ্টি বিজ্ঞানীরা দুধের উপরই আস্থা রাখেন সর্বাধিক। কেবল তাইই নয়। অধিকাংশ মানুষের খাদ্য তালিকায় দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাদ্যগুলি পছন্দের নিরীখে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে। আর শিশুদের শরীরের পুষ্টিতে দুধের ভূমিকার বিষয়টি প্রশ্নাতীত। শিশুরা যতদিন না শক্ত আহার গ্রহণ সক্ষম হচ্ছে ততদিন দুধই হল তার একমাত্র আহার। কেবলমাত্র মানব শিশু নয় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর শাবকরা মাতৃদুগ্ধ পান করেই তাদের জীবন শুরু করে থাকে। মানবশিশুর ক্ষেত্রে উল্লেখ্য বিষয়টি হল সে মাতৃদুগ্ধের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণী যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি প্রাণীর দুগ্ধ পান করে থাকে। এর কারণ হল – মানুষ পশুপালন রপ্ত করার সাথে সাথে প্রাণী দুগ্ধ সংগ্রহ করে তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়াকরণ বিজ্ঞানটিকে সে আয়ত্ত করেছে এবং তা বিকশিত করেছে। তাই মানুষই একমাত্র জীব যে মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত হিসাবে প্রাণী দুগ্ধ গ্রহণ করে। যদিও শ্রেণীবিভক্ত মানব সমাজে অধিকাংশ শ্রমজীবী পরিবারের ক্ষেত্রে দুধের মত বহু প্রয়োজনীয় জিনিস তা ক্রয় করার সামর্থ্যের অভাবে ভাগে মেলে না। এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে চাহিদা স্থির হয় সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে নয়। যাই হোক, শিশুর জন্য ব্যবহার্য প্রাণী দুগ্ধটি সঠিক মানের হওয়া খুবই প্রয়োজন। দুধের সমস্ত উপাদানগুলির মাত্রা গ্রহীতার প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

কিন্তু যে দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য ব্যতীত বর্তমান দুনিয়ায় মানুষের খাদ্য তালিকা অসম্পূর্ণ থাকে সেই দুধ বর্তমানে 'হোয়াইট পয়জন' বা 'ধবল গরল' নামে আখ্যা পাচ্ছে। FSSAI (Food Safety and Standard Authority of India) নামক কেন্দ্রীয় সংস্থার একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে সমগ্র দেশের ৭০-৭৫ শতাংশ দুধের গুণমান সঠিক নয় এমনকি তা অত্যন্ত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা দূষিত। যার ব্যবহারে শিশুতো কোন ছাড় সুস্থ স্বাভাবিক মানুষও রোগগ্রস্ত হয়ে যায়। দেশের সমস্ত রাজ্যে বাজারীকৃত দুধের নমুনা সংগ্রহ করে তার গুণমান যাচাই করে দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মিজোরাম, ঝাড়খন্ডে প্রায় ১০০% দুধের নমুনাই দূষিত কিংবা ভেজালীকৃত বা দুধের মতো সাদা তরল যাতে দুধের প্রাকৃতিক উপাদানগুলি প্রায় অনুপস্থিত। যা গ্রহণ করলে গ্রহীতার শরীরে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আশু প্রভাব হিসাবে আন্ত্রিক, খাদ্যবিষক্রিয়া ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব যেমন হৃৎপিন্ডের স্থায়ী সমস্যা, কর্কট রোগ বা কিডনীর সমস্যা এমনকি অকালমৃত্যুও ঘটতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। তবে একথা এখন সকলেরই জানা যে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে দুধের মত সমস্ত জিনিসই নানা গুণমানে পাওয়া যায়। যত গুড় তত মিষ্টি। স্বল্পমূল্যের পণ্যে ভেজালের মাত্রা বেশি আর দামী, অতি দামী পণ্যে সাধারণভাবে কম। বর্তমানে আবার দুধের বদলে হোয়াইটনার (দুধের মত রঙ করবে খাবারে) পাওয়া যায় নামী দামী ব্রান্ডের।

দুধে ভেজাল কে মেশায় ?

'এক পোয়া দুধে তিন পোয়া পানি আমার নাম বিধু গোয়ালানী'। সরাসরি গোয়ালাদের কাছ থেকে দুধ ক্রয় করার যখন রেওয়াজ ছিল তখন দুধে জল মেশানোর এমন অভিযোগ গোয়ালাদেরই শুনতে হত। কিন্তু বর্তমানে দুগ্ধ উৎপাদন ও বন্টন প্রক্রিয়াটির সামাজিকীকরণ ঘটেছে। দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিটি মূলতঃ ত্রিস্তরীয়। প্রথম স্তর হল প্রাথমিক দুগ্ধ সংগ্রাহক বা গোয়ালা, দ্বিতীয় স্তর হল দুগ্ধ সমবায় সমিতি ও তৃতীয় স্তর হল মিল্ক ফেডারেশন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় গোয়ালা বা দালালদের মাধ্যমে সরাসরি চিলিং প্ল্যান্টে দুগ্ধ সরবরাহ হয়ে থাকে। গোয়ালারা তাদের দ্বারা সংগৃহীত দুধ সমবায় সমিতি'র কাছে বিক্রি করে। সমবায় সমিতি ঐ দুধের যাবতীয় গুণমান পরীক্ষা করে তা গ্রহণযোগ্য হলে তা চিলিং প্ল্যান্ট বা শীতলীকরণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তীতে ঐ দুধকে জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন দুগ্ধজাত খাদ্যপণ্য তৈরী করার জন্য দুধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে আলাদা করা হয়। দুগ্ধজাত পণ্যের মধ্যে লিকুইড মিল্ক ছাড়াও রয়েছে ঘি, চীজ, বাটার, দই, পনীর আইসক্রীম, গুড়ো দুধ ইত্যাদি। FSSAI-এর পরিসংখ্যান বলছে প্রাথমিক উৎপাদক অর্থাৎ গোয়ালাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ৩০% নমুনায় ভেজাল সনাক্ত করা গেছে সেখানে বাজারীকৃত দুধের ৯০% নমুনায় ভেজাল মিলেছে। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে

দুগ্ধ উৎপাদন থেকে বাজারীকরণের প্রতিটি স্তরেই ভেজাল চক্র সক্রিয়। তাই ভেজাল মেশানোর দায় কোন ব্যক্তি নয় বরং সমগ্র দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার উপরই বর্তায়।

ভেজাল হিসাবে কোন কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয় এবং কেন ব্যবহার করা হয় ?

অতীতে দুধের পরিমাণকে বৃদ্ধি করার জন্য কেবলমাত্র জলই মেশানো হত। বর্তমানে জলের পাশাপাশি, চিনি, গ্লুকোজ, ময়দা, লবণ, গুড়া সাবান, ফর্মালিন, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট, নানা অ্যান্টি বায়োটিক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি পদার্থ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে নয় বরং বাজারের তথা মুনাফার কথা মাথায় রেখেই করা হয়।

বিশুদ্ধ জল মানুষের শরীরে কোন বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে না কিন্তু দুধে জল মেশালে দুধের উপাদানগুলির ও সর্বোপরি দুধের ঘনত্ব হ্রাস করে। এই তরলীকৃত দুধ প্রাপ্ত বয়স্কদের শরীরে তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব না ফেললেও, শিশুদের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। দুধের উপাদানের ঘনত্ব মাতৃদুগ্ধের উপাদানের ঘনত্বের সঙ্গে খুব বেশি তারতম্য ঘটলে শিশুদের শরীরে তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না ফলে আন্ত্রিক, ভেদবমন ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। ব্যবহৃত জল যদি জীবাণুমুক্ত না হয় তাহলে পরিণাম আরও মারাত্মক হতে পারে। খাদক, বিভিন্ন জলবাহিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ল্যাকটোমিটার বা ঘনত্ব পরীক্ষায় যন্ত্রে যাতে ঘনত্বের তারতম্য ধরা না পড়ে তার জন্য ভেজাল প্রদাণকারীরা তরলীকৃত দুধের ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেটের মতো রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে।

বিশুদ্ধ দুধের উপাদান ও তার শতকরা পরিমাণ মোটামুটি এই রকম ঃ জল - ৮৭.৭%, ল্যাকটোজ (শর্করা) ৫%, স্নেহ বা ফ্যাট জাতীয় পদার্থ - ৩.৩%, প্রোটিন (কেসিন) ৩.৩%, খনিজ পদার্থ - ০.৭%, গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদি দুগ্ধ উৎপাদক প্রাণীর জাতি ও প্রজাতি ভেদে দুধের উপাদানের শতকরা পরিমাণের তারতম্য ঘটে থাকে।

ভেজাল দ্রব্য	কী কারণে প্রয়োগ করা হয়	ক্ষতিকর প্রভাব
গ্লুকোজ, চিনি সাধারণ লবণ	দুধের তরলীকরণের ফলে ল্যাকটোজ নামক শর্করার পরিমাণের ঘাটতি পূরণের জন্য গ্লুকোজ বা চিনি (সুক্রোজ) প্রয়োগ করা হয়। বিশুদ্ধ দুধের সদৃশ নকল স্বাদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়।	উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক কিডনি সমস্যায় ভুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রেও এটি মারাত্মক
ময়দা, অ্যারারুট (স্টার্চ)	দুধের তারল্য হ্রাস করে ও দুধের ছানা কেটে যাওয়া (Curdling of milk)-কে প্রতিহত করতে পারে।	অন্ত্রে পরিপাক না হওয়া অতিরিক্ত স্টার্চ আন্ত্রিকের কারণ হতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের রোগীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্টার্চ অত্যন্ত ক্ষতিকারক।
হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড	এটিকে দুধের প্রসাধনী বলা হয়। দুধকে দীর্ঘক্ষণ তাজা বলে মনে হবার কারণে এটি প্রয়োগ করা হয়।	গ্যাসট্রো ইনটেস্টাইন কোষ স্তরকে ধ্বংস করে। অন্ত্রের কার্যকলাপকে প্রতিহত করে।
গুঁড়ো সাবান	দুধের স্নেহজাতীয় পদার্থকে দ্রবীভূত করে ফেনা সৃষ্টি করে ও বিশুদ্ধ দুধের মতো সাদা রং সৃষ্টি করে	অন্ত্রের গোলযোগ সৃষ্টি করে।

অ্যান্টিবায়োটিক	দুধের পচন রোধ করার জন্য স্থায়িত্ব বৃদ্ধির বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি বায়োটিক দুধে প্রয়োগ করা হয়।	অকারণে অ্যান্টিবায়োটিক সেবনে দেহের উপকারী ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস হয় ফলে দেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যহত হয় ও অপকারী ব্যাকটিরিয়ার সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

দুগ্ধ জাত পদার্থে ভেজালের মাত্রা ও তার ক্ষতিকর প্রভাব বহুগুণ বেশি।

দুধ বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর আসল কারণ কি ?

সাধারণত ক্রেতার প্রত্যাশা বা চাহিদার সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের গুণমানের সামঞ্জস্য না ঘটলেই সেই খাদ্য দ্রব্যকে আমরা ভেজাল খাদ্য হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি অর্থাৎ দ্রব্যের গুণগত মানকে অসৎ উপায়ে পরিবর্তন করে অধিক মুনাফা করা। একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হোক বা দেশী বিদেশী খাদ্য উৎপাদনকারী বৃহৎ কোম্পানি হোক, সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হল মুনাফা সৃষ্টি করা। এখানে কেবলমাত্র দুধে ভেজাল মেশানোর বিষয়টিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ না করে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোটিকে সামগ্রিক ভাবে দেখা উচিত, কারণ খাদ্যে ভেজাল মেশানোর আসল কারণটি অদ্বিতীয় এবং তা হল কেবল মুনাফা। দুধের ক্ষেত্রে, দুধের প্রতিটি উপাদন পৃথকভাবে বাজারীকৃত করা হয়। দেশী বিদেশী বিভিন্ন কোম্পানি ও স্থানীয় স্তরে দুগ্ধ উৎপাদক ও যোগানদারেরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার দখল করার ঘৃণ্য কর্মকান্ডে লিপ্ত – দুধের গুণমান বজায় রাখার বিষয়টি এখানে নিশ্চিত ভাবে উপেক্ষিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি পণ্যের বদলে অন্য পণ্য দিয়ে ক্রেতাকে ঠকানো হয়। সত্তরের দশক থেকে 'অপারেশন ফ্লাড'-এর সময় থেকেই প্রায় সারা দেশে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে ধাপে ধাপে ও অচিরেই তা আধুনিক প্রযুক্তিতে সেজে ওঠে। বর্তমানে প্রায় সমস্ত রাজ্যেই দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরনের পরিকাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু এই পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে দেশী, বিদেশী সরকারী, বেসরকারী দুগ্ধ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজারে টিকে থাকার লড়াইয়ে ব্যস্ত। আর টিঁকে থাকার জন্য প্রয়োজন আরও মুনাফা, আরও ভেজাল প্রদান, আরও বাজার। দুগ্ধ উৎপাদন থেকে বাজারীকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই চলছে দালালরাজ মাফিয়া রাজ। সরকারী দুগ্ধ পরীক্ষাকেন্দ্রের নিয়মকানুনকে ধোঁকা দিয়ে সরকারী আইনের তোয়াক্কা না করে বহুক্ষেত্রে কেবলমাত্র গায়ের জোরে নিজেদের তৈরী নিয়মনীতি জারি রাখছে। উৎপাদক সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধ থাকলেও সর্বশেষে সমঝোতা করেই বাজারে রাজ করছে তারা।

তাহলে সরকারের ভূমিকা কী?

১৯৪৭ পরবর্তী পর্যায়ে ভেজাল প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন তৈরী হয় ১৯৫৪ সালে। তাতে বলা হয় খাদ্যে ভেজাল প্রদানকারী ও ভেজাল খাদ্য বিক্রয়কারীর সাজা হল সর্বনিম্ন ছয় মাস ও সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে এই আইন সংশোধিত হয়ে শাস্তির মাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত বাজারী নজরদারীর দায়িত্বে রয়েছে FSSAI নামক কেন্দ্রীয় সংস্থা। FSSAI-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের বাজারীকৃত দুধের ৭০% ভেজাল। আবার অন্যদিকে ভেজালকারীদের শাস্তির কথাও আইনে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে তার শাস্তির বিষয়টি বিশেষ শোনা যায় না। তাই ভেজালকারীদের শাস্তি দেবার কোনও বাসনা রাষ্ট্রশক্তির নেই, এটা পরিষ্কার। অর্থাৎ, আইন রয়েছে আইনের জায়গায় আর ভেজালকারীরা রয়েছে সুরক্ষিত। মাঝেমাঝে বৃহৎ কোম্পানিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বে ওঠা ভেজালের অভিযোগ ঘটা করে প্রচার করা হয়। আবার অচিরেই বোঝাপড়া হয়ে যায়।

তাহলে ভেজালের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় কি?

বর্তমান মুনাফাভোগী পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে ভেজালের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার বাসনা একটি দিবা স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বর্তমান ব্যবস্থায় যেহেতু সমস্ত খাদ্যবস্তুর উৎপাদন সামাজিকীকরণ হয়ে গেছে তাই ভেজাল প্রদানেও সামাজীকিকরণ হয়েছে। তাই এর সমাধান সামাজিকভাবেই করতে হবে। দুই একজন ছোট ব্যবসায়ীকে ভেজালকারী হিসাবে চিহ্নিত করে ও তাকে শাস্তি দিয়ে আসল সমস্যার সমাধান অসম্ভব। ■

কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখে কারা ঃ

বাড়ির সামনে নীল জলের বোতল ঝোলানো

রাস্তার কুকুর-বেড়ালের পায়খানা-পেচ্ছাপ বন্ধ হবে!

বিগত কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব শহর-গঞ্জের বাড়ির সামনে একটা দৃশ্য নজর করলেই আমরা দেখতে পেয়েছি। বাড়ির গেটের সামনে দড়িতে ঝোলানো একটা প্লাস্টিকের বোতল যাতে নীল বা বেগুনী রঙের জল ভরা। কেন? না এটা ঝুলিয়ে রাখলে বাড়ির সামনে কুকুর-বেড়াল নাকি আর পায়খানা-পেচ্ছাপ করবে না! কৃষ্ণনগর থেকে কাকদ্বীপ, মালদহ থেকে ময়নাগুড়ি, কলকাতা থেকে আসানসোল যেখানেই যান একই দৃশ্য দেখা যাবে। মানব সমাজকে এই প্রাকৃতিক দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার এই মহৌষধি/এই ম্যাজিক আবিষ্কার করল কে, কবে, কোথায়? আমরা রাজধানী কলকাতা থেকে বিভিন্ন জেলায় সাধারণ মানুষকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। সঠিক উত্তর মেলেনি। আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহস্থদের প্রশ্ন করেছিলাম – "এতে কাজ হচ্ছে? বন্ধ হয়েছে কুকুর-বেড়ালের পায়খানা-পেচ্ছাপ?" কলকাতার মানিকতলা অঞ্চরের মীরাদি জবাবে বললেন "ধ্যুস! কোথায়? ঐ দেখুন বোতলের নিচে কুকুর পটি করে রেখেছে।" প্রশ্ন করা হল তবে ঝুলিয়েছেন কেন? মীরাদি বললেন "কি করবো? সবাই তো ঝুলিয়েছে, তাই ..."। জানতে চাওয়া হল "পাড়া থেকে কুকুর বেড়াল উচ্ছেদ করলেই তো ..."। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মীরাদি বললেন "না না ওরা অবলা জীব। তা কি করে হয়! তাছাড়া কুকুর পাড়া পাহারা দেয় আর বেড়াল তো মা ষষ্ঠীর বাহন!"

বকুলতলার বণানী দেবীকে জিজ্ঞাসা করা হল "বাড়ির গেটে নীল জলের বোতল ঝুলিয়ে কেমন কাজ হচ্ছে?" জবাবে গৃহিনী বললেন "প্রথম প্রথম মনে হয় কিছু কাজ হচ্ছিল। এখন তো দেখছি সেই আগের মতই অবস্থা!" আমরা বললাম "মানে! প্রথম প্রথম কুকুর-বেড়াল পায়খানা পেচ্ছাপ বন্ধ করে দিয়েছিল?" আমাদের জবাবে ঘাবড়ে গিয়ে বণানী দেবী বললেন "না, মানে, ওই ইয়ে আর কি? হয়ত ওরা অন্য কোথাও ...।"

বণানী দেবীর জবাবে রেগে গিয়ে পাশের বাড়ির মেয়ে পিংকি বলল "ও, অন্য কোথাও ওদের পায়খানা বাথরুম হয়েছে বুঝি?"

বণানীদেবী আর পিংকির কথা বেহালার মালাদেবীকে বলায় উনি হেসে গড়িয়ে পড়ে বিদ্রুপ করে বলেন "করপোরেশনের উচিৎ ওদের জন্য আলাদা বিনামূল্যে সুলভ কমপ্লেক্স গড়ে

দেওয়া! ওরা তো আর পয়সা দিতে পারবে না!"

শুধুমাত্র কলকাতা শহর বা রাজ্যের নানা শহরের মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা নন; দামী সুদৃশ্য অট্টালিকা, নামী-দামী সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল, বড় বড় অফিস কোথাও প্রায় বাকি নেই। সর্বত্র একই দৃশ্য প্লাস্টিকের বোতলে ভরা নীল জল।

দমদমের অধিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সঞ্জীবকে প্রশ্ন করায় সে বলল "ইন্টারনেটে দেখেছি জাপানের মানুষ নাকি কুকুরের পায়খানা-পেচ্ছাপের জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে বাড়িতে নীল জলের বোতল ঝোলানো প্রথম শুরু করেছিল। ওখানে এতে নাকি কাজ হয়েছিল। এখানে কেন কাজ হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। হয়ত আলাদা স্পিসিস"। সঞ্জীবের বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথার জবাবে বলা হল পৃথিবীতে যত কুকুর আছে তারা একই প্রজাতির বা একই স্পিসিস। এদের নানা সাবস্পিসিস আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সঞ্জীব ছাড়ার পাত্র নয়। সে বলল "আরে চীন-জাপান ওরাই তো এসব বিষয়ে এক্সপার্ট। ফেন সুই ব্যাপারটা তো ওদের ওখান থেকেই এসেছে। ঐ নীল জল দেখে কুকুরদের চোখে একরকম রিঅ্যাকশন হয়েছিল। তাই ওখানকার কুকুররা পেচ্ছাপ-পায়খানা বন্ধ করে দিয়েছিল।" জবাবে বলা হল "সে কি পেচ্ছাপ-পায়খানা বন্ধ করে দিয়েছিল।" একটু অপ্রস্তুত হয়ে সঞ্জীব বলল "না, তা নয়। হয়ত অন্য কোথাও ... নীল জল যেখানে নেই ...।"

মুখে মুখে এইসব অপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছড়াচ্ছে সর্বত্র এবং তা ছড়াচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে। গণ হিস্টিরিয়া (যেমন

কোরো সিনড্রোম) দ্বারা যেমন কোটি কোটি মানসিকভাবে দুর্বল মানুষকে আক্রান্ত করা যায় এবং বিক্রি হয় কোটি কোটি টাকার ওষুধ-সেলাইন ইত্যাদি। এও তেমনি এক মাস (mass) প্রোপাগান্ডা। এই প্রোপাগান্ডার পেছনে থাকে এক গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য। সমাজের মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবকে কাজে লাগাতে এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। প্রতিটি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কর্তব্য এই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে মানুষের কাছে প্রকৃত সত্যকে হাজির করা।

প্রাণীবিজ্ঞান বলছে কুকুর বেড়াল প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বাস্তবে স্বাভাবিক কালার ব্লাইন্ড। এরা হলুদ ও নীল (Yellow and Indigo) ছাড়া অন্য রঙ মানুষের মত দেখতে পায় না, বাকি সবই দেখে ধূসর বা গ্রে হিসাবে। বিজ্ঞানের এই সত্যটাকে ব্যবহার করে এসেছে নীল রঙ করা জলের গল্প। প্রাণীবিজ্ঞান এও বলে যে ওই নীল বা হলুদ রঙ দেখে কুকুর-বেড়ালের শারিরীক-মানসিক কোনও বৈকল্য আসে না। তবে তো আকাশ দেখে বা সমুদ্রের জল দেখে কুকুর-বেড়াল পায়খানা পেচ্ছাপ বন্ধ করে দিত। কেউ কি সমুদ্রের পাড়ে কুকুর-বেড়ালকে পায়খানা-পেচ্ছাপ করতে দেখেন নি! নীল রঙের বাড়ি, নীল গাড়ি, নীল শাড়ি, জামা এসব দেখে কুকুর বেড়ালকে কেউ কোনদিন অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখেছেন কী? দেখেন নি। কোন রঙ দেখা বা না দেখায় কুকুরের তেমন কিছু এসে যায় না। এরা সামাজিক জীব নয়।

অনেকে আবার প্রচার করছেন যে ওই বোতলের জল থেকে যে গন্ধ বার হয় সেই গন্ধে কুকুর-বেড়াল দূরে সরে যায়। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি বেশি থাকার জন্য নাকি এমন হয়। অথচ নীল/উজালায় চুবিয়ে দড়িতে মেলে দেওয়া কাপড় থেকে তো তবে গন্ধ আরও বেশি ছড়ায়। এই কাপড় মেললে কুকুর-বেড়ালকে পালাতে দেখেছেন কেউ?

তবে এই সংগঠিত গুজবের উদ্দেশ্য কী? এর একটা উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক। প্রতিদিন প্লাস্টিকের বোতলে নীল জল ভরতে লাগছে কাপড় সাদা করার কেমিক্যাল। এই গণ প্রোপাগান্ডায় ভারতে উজালা সুপ্রিম (জ্যোতি ল্যাবরেটরি) এবং রবীন ব্লু (হিন্দুস্তান লিভার) কোটি কোটি টাকার মুনাফা করেছে। ফল না পেয়ে একটা অঞ্চলে ব্যবহার কমলেও সুকৌশলি প্রোপাগান্ডায় অন্যত্র তার ব্যবসা বাড়ছে। এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের পাশাপাশি এই ধরণের অবৈজ্ঞানিক প্রোপাগান্ডার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর থাকে সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য। এই সামাজিক মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যই গুজব ছড়ানোর প্রধান কারণ। গুজব ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে কতটা বোকা বানানো যায় নিরন্তর চলে তারও পরীক্ষা। সামাজিক শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের সংগঠিত সংগ্রামের সবচেয়ে বড় বাধা হল কুসংস্কারের অন্ধকূপে থাকা। বিজ্ঞান মনস্ক প্রতিটি মানুষের তাই দায়িত্ব অনেক।■

‘জ্যোতিষবিদ্যা এক সাংঘাতিক ফাঁদ’

–নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ভেঙ্কটরমন

ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেল পুরস্কার জয়ী বিজ্ঞানী স্যার ভেঙ্কটরমন রামকৃষ্ণাণ ভারতের জনগণের উদ্দেশ্যে লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারে গত ৩০শে জুন বলেছেন “জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হওয়া বন্ধ করুন।” জ্যোতিষবিদ্যাকে তিনি এক সাংঘাতিক ফাঁদ বলে আখ্যা দেন এবং এই প্রশ্নে রাষ্ট্রনেতাদের খুব ভর্ৎসনা করেছেন। এই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ভারতীয়দের মধ্যে জ্যোতিষ সংক্রান্ত কুসংস্কারের প্রভাবের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে তিনি চিন্তিত। এই ধরনের কুসংস্কার মানুষকে দুর্বল করে দেয় এবং মানুষ নিজে থেকে কিছু স্বউদ্যোগে করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে এবং কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পায়। সবকিছুর জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভন্ড লোকজন তাদের কাছ থেকে টাকা লুঠতে থাকে। ভারতে এমন উদাহরণও ভূরি ভূরি আছে যেখানে ভন্ড সাধু, জ্যোতিষ ইত্যাদির পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন সাধারণ মানুষ। বিজ্ঞানে এত এগিয়ে থেকেও ভারতের এমন অবস্থার জন্য আক্ষেপ করেছেন ভেঙ্কটরমন। ভারতের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থার জন্য তিনি সরাসরি আঙুল তুলেছেন রাষ্ট্রনেতাদের দিকে। রাষ্ট্রনেতারা আঙুলে পাথর পড়ে থাকেন, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হন। এর প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। এইসব নেতারা অনেক সময় এমন কি টাকা দিয়েও জ্যোতিষীদের দিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমত ভবিষ্যৎবাণী করিয়ে নেন বলেও দাবি করেন বিজ্ঞানী ভেঙ্কটরমন।

বিজ্ঞানী ভেঙ্কটরমন রামকৃষ্ণাণ বর্তমানে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের মলিকুলার বায়োলজি বিভাগে প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন। ১৬ বছর আগে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে লন্ডনে চলে আসেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি বার বার তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানের উপর আস্থা রাখতে বলেছেন।

[সূত্রঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১লা জুলাই ২০১৫]

বিজ্ঞানের খবর

জুন ২০১৫

২.●নাসা জানাচ্ছে যে ALICE স্পেকটোগ্রাফ যা রস্ট্রো স্পেস প্রোব থেকে '৬৭ পি চুরিমভ' কমেটকে নিরীক্ষণ করছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছে। এই তথ্যটি হল – সৌর কিরণের দ্বারা কমেটস্থিত জলকণা ভেঙে ফোটন কণার সৃষ্টি হয় (ফোটনাইজেশন)।

●গবেষকরা আবিষ্কার করলেন সেই মূল প্রোটিনকে যা বয়সের সাথে সাথে পেশীর মাংস এবং শক্তিবৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা নেয়।

●বিজ্ঞানীরা এই প্রথম পরিক্ষাগারে ইঁদুরের পায়ের জন্ম দিলেন।

৩.●দীর্ঘ ২ বছরের বিরতির পর, অতিকায় এই যন্ত্রটির সারাই ও উন্নতিকরণের পর লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার পুনরায় চালু হল। যন্ত্রটি এখন ৮ থেকে ১৩ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট উচ্চশক্তিতে পরীক্ষা চালাতে পারবে।

৪.●বিজ্ঞানীরা প্রাণীর শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিসটেন্সকে প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

৮.●নাসার বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহে impact glass-এর (ভূমিকম্প, উল্কাপাত বা অগ্নুৎপাতের দ্বারা সৃষ্ট অকেলাসিত যৌগ) সঞ্চিত ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানীদের অনুমান এই সঞ্চিত পদার্থ থেকে প্রাচীন যুগের প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলবে।

৯.●গবেষকরা সাড়ে সাত কোটি বছরের পুরাতন ডাইনোসর ফসিলের লোহিত রক্ত কণিকার এবং সংযোগ কলার সন্ধান পেয়েছেন।

১০.●বেলজিয়ামের এক বয়স্ক মহিলা তার কিশোরী বয়সে সংগৃহীত এবং হিমায়িত ডিম্বানুকে গর্ভে পুনর্স্থাপিত করে অনেক বেশি বয়সে প্রথম মা হলেন।

১৬.●মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিশ এন্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিস (মৎস এবং বন্য প্রাণী দপ্তর) জানিয়েছে যে ইস্টার্ন কগার নামক এক প্রকার প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

১৭.●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে বিগ ব্যাং-এর ৮০০ মিলিয়ন বছর পর একটি নক্ষত্রের জন্ম হয়েছিল যার রাসায়নিক পদার্থ এমন ছিল যা থেকে প্রাণ থাকার উপযোগী গ্রহের জন্ম হয়ে থাকতে পারে। ঐ নক্ষত্রটি আমাদের সূর্যের প্রায় অনুরূপ এবং বর্তমানে তা কসমস রেডশিট ৭ গ্যালাক্সিতে অবস্থান করছে পৃথিবী থেকে ১২.৯ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে।

১৮.●একটি জিনকে পুনরায় সজীব করে ইঁদুরের পৌষ্টিকতন্ত্রের (কোলোরেকটাল) ক্যানসার আক্রান্ত কোষের বৃদ্ধি ৪ দিনের মধ্যে বন্ধ করা গেছে এবং পৌষ্টিকতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া চালু করা গেছে। এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেল জার্নালে।

২৪.●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জি জে ৪৩৬বি নামক এক বিশাল উল্কাসদৃশ গ্রহের সন্ধান পেলেন যা পৃথিবী থেকে ৩৩ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

২৫.●বিজ্ঞানীরা এম এম ৪১ নামক একটি নতুন যৌগ আবিষ্কার করেছেন যার প্রয়োগে ইঁদুরের অগ্নাশয়ের ক্যানসার আক্রান্ত টিউমারকে প্রায় ৮০ শতাংশ ছোট করা গেছে।

২৬.●ভূপদার্থবিদরা পৃথিবীতে অবস্থিত সবচেয়ে বড় ইমপ্যাক্ট ক্রেটর (৬ কিমি ব্যাসযুক্ত) আবিষ্কার করলেন।

৩০.●গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিদরা একটি নতুন মডেলের (বিগ রিপ) জন্ম দিলেন যা মহাবিশ্বের ধ্বংসকে ব্যাখ্যা করে।

জুলাই ২০১৫

২.●প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথের সম্পূর্ণ জিনগত বৈশিষ্ট জানা সম্পূর্ণ হল।

৮.●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ৫টি নক্ষত্রের একটি সিসটেম আবিষ্কার করলেন যা খুবই কম দেখা যায়।

১৩.●লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার দুটি কণার সন্ধান পেয়েছে যারা পেন্টাকোয়ার্ক নামক নতুন শ্রেণীভুক্ত।

১৪.●নাসার নিউ হরাইজন স্পেসক্রাফট এই প্রথম সূর্যের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ প্লুটো প্রদক্ষিণ করল।

১৬.●পদার্থবিজ্ঞানী ৮৫ বছরের গবেষণার দ্বারা ভরহীন কোয়াসি পার্টিকল ওয়েলি ফার্মিয়নকে আবিষ্কার করল। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাবে যেমন কোয়ান্টাম কম্পিউটিং।

২১.●পরিবর্তিত শর্করা অনুকে বিশ্লেষণ করে এক নতুন শ্রেণীর অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার হল।

২৩.●নাসা ঘোষণা করেছে যে মহাবিশ্বে কেপলার ৪৫২বি নামক একটি নক্ষত্র আছে যা আমাদের সূর্যের মত।

২৪.●ব্রাজিলের পুরাজীববিদরা (প্যালিওনটোলজিস্ট) ১৩৩ মিলিয়ন বছর প্রাচীন **টেরাপোডোফিস অ্যামপ্লেকটাস** নামক প্রথম চারপেয়ে সাপের জীবাশ্ম আবিষ্কার করল।

২৯.●প্রথম কৃত্রিম রাইবোজোমের সৃষ্টি করল ইলিনোইস শিকাগো এবং নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

৩১.●কানাডার পাবলিক হেলথ এজেন্সি প্রাথমিক পরীক্ষায় একটি ইবোলা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে ১০০ শতাংশ সফল হল।

অগাস্ট ২০১৫

৫.●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কেচ অবজারভেটরি থেকে ঘোষণা করলেন যে পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান সবচেয়ে দূরবর্তী গ্যালাক্সি এত দূরে অবস্থিত যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে ১৩.২ বিলিয়ন বর্ষ সময় লাগবে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'ই জি এস ওয়াই ৮ পি ৭'।

৬.●ব্রাজিলের প্রাণীবিজ্ঞানীরা প্রথম দুটি বিষধর ব্যাঙের আবিষ্কার করেছেন যাদের বৈজ্ঞানিক নাম যথাক্রমে **করিথোম্যানটিস গ্রীনিংগি** এবং **অ্যাপারাস্ফেনোডন ব্রনোই**।

১০.●মহাবিশ্বের বৃহত্তর অংশের শক্তি নির্গমনকে অতীতের চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্মভাবে বিচার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মহাবিশ্ব ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

১৩.●নাসার বিজ্ঞানীরা চাঁদের আবহমন্ডল এবং ধূলিকণা LADEE স্পেসক্রাফট থেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে চাঁদের বহিঃআবহমন্ডলে (এক্সোস্ফিয়ার) নিয়ন পরমাণু উপস্থিত।

●জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন কিভাবে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডকে কার্বন ন্যানোফাইবারে রূপান্তরিত করা যায়।

● বিজ্ঞানীরা স্টেম সেলের সাহায্যে একটি অতি ক্ষুদ্র মানব মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছেন যা গর্ভস্থ শিশুর ৫ সপ্তাহ বয়সের সমান। এটাই সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি যার সাহায্যে মানব মস্তিষ্ক সৃষ্টি করা গেল এবং তার সাহায্যে ওষুধের সঠিক কার্যকারিতা প্রমাণ করা যাবে।

২৪.●মেয়ো ক্লিনিক নামক একটি চিকিৎসাকেন্দ্র দ্বারা একটি নতুন পদ্ধতিতে ক্যানসার আক্রান্ত কোষের বৃদ্ধি ঠেকাতে PLEKHA 7 নামক একপ্রকার প্রোটিনের ব্যবহার করে সাফল্য পাওয়া গেছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৫

১.●প্যালিওটোলজিস্টরা ৪৬৭.৩ মিলিয়ন বছর প্রাচীন এক সামুদ্রিক স্করপিয়ন (ইউরিপটেরিডা)'র জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ ফুটো কাছাকাছি। **পেন্টকোপ্টেরাস ডেকোরাহেনস** নামের এই প্রাণীটাই সবচেয়ে প্রাচীন প্রিডেটরস।

৩.●পৃথিবীতে বর্তমানে ৩ ট্রিলিয়ন বা তার কিছু বেশি উদ্ভিদ জীবিত আছে।

●লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে কর্মরত বিজ্ঞানীরা রিপোর্ট করেছেন যে তারা এই পরীক্ষাগারে কোয়ার্ক গ্লুয়ন প্লাসমা পেয়েছেন যা পদার্থের একটি অবস্থা।

১০.●প্যালিওনটোলজিস্টরা রিপোর্ট করেছেন যে সম্প্রতি ১৫টি আংশিক হাড়ের জীবাশ্ম দিয়ে মানুষের মত প্রজাতি**হোমো নালেডি** গঠন করা হয়েছে। এই প্রজাতিটি যথাসম্ভব আফ্রিকায় বসবাস করত এবং প্রাচীন মানুষের মত সাংস্কৃতিক গুণ ছিল (ritualistic behaviour) যদিও বিজ্ঞানীদের মতে এটা প্রমাণ করতে আরও অনেক তথ্যের প্রয়োজন।

১১.●নাসা এই প্রথম প্লুটো গ্রহের ছোট উপগ্রহ নিক্স-এর ছবি প্রকাশ করল। এই উপগ্রহটির পরিধি অমসৃণ এবং এতে ক্রেটর থাকার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

১৫.● শনিগ্রহের উপগ্রহ (ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয়) এনসেল্যাডাস-এর বরফযুক্ত ভূত্বকের নিচে সমুদ্রের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছে নাসা।

১৬.●জুওলজিক্যাল সোসাইটি অব লন্ডন ঘোষণা করেছে যে ১৯৭০ সাল থেকে পৃথিবীর মোট সামুদ্রিক প্রাণী, পাখি, মাছ এবং সরীসৃপের সংখ্যা প্রায় ৪৯ শতাংশ কমে গেছে।

২২.●বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে সম্প্রতি ডাইনোসরের একটি নুতন প্রজাতি **উরুনালুক কুকপিকেনসিস** আবিষ্কৃত হয়েছে। এই জীবাশ্মটি প্রায় ৩০ ফুট লম্বা, শাকাহারি এবং সুমেরু নিকটবর্তী অঞ্চলে আজ থেকে ৬৯ মিলিয়ন বছর আগে যার উপস্থিতি ছিল।

২৮.●নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তারা এই প্রথম মঙ্গল গ্রহে তরল অতি লবনাক্ত জলের অস্তিত্ব পেয়েছেন যা মঙ্গলগ্রহের উপর প্রবাহিত হচ্ছে। ■

"Imagine"

John Lennon

Imagine there's no Heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today.

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace.

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one.

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
sharing all the world.

ভেবে দেখ যদি এমন হত

জন লেনন-এর গান 'Imagine'-এর বঙ্গানুবাদ

ভেবে দেখ, যদি এমন হত –
স্বর্গ বলে আলাদা কিছু নেই!
চাইলেই তোমরা ভাবতে পার –
পায়ের তলায় নরক বলেও কিছু নেই,
মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ শুধুই।
ভেবে দেখ – আমরা সবাই বাঁচি
এই জীবনের জন্যই।

ভেবে দেখ, যদি এমন হত –
এদেশ-ওদেশ কোন বেড়াজাল নেই!
এটা করা এমন কঠিন কি আর –
কেউ যেখানে কাউকে মারবে না,
কারও জন্য কাউকে মরতে হবে না,
আর কোন ধর্মের শাসানিও নেই।
ভেবে দেখ – মানুষ
জীবন কাটাবে শান্তিতেই।

তুমি বলতেই পার –
আমি স্বপ্ন দেখছি।
কিন্তু এ স্বপ্ন শুধু
আমার একার নয়।
জানি তুমিও একদিন
আমাদের সাথে আসবে
পৃথিবীতে একতা হবে-সবার জন্য
পৃথিবী হবে একটাই।

ভেবে দেখ, যদি এমন হত –
পৃথিবীতে কোন দখলদারি নেই!
সেই দিন হবে খুব বিস্ময়ের –
লোভের কোন কারণ থাকবে না,
না খেতে পেয়ে কেউ মরবে না,
মানুষ মানুষ ভাই-ভাই।
কল্পনা কর – আমাদের জন্য
গোটা পৃথিবীটাই!

পঞ্চম বর্ষ ■ সংখ্যা ২ ■ ডিসেম্বর ২০১৫ Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না

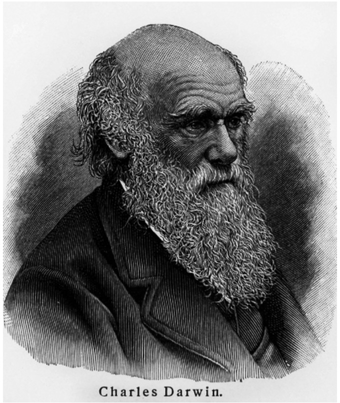

Charles Darwin.

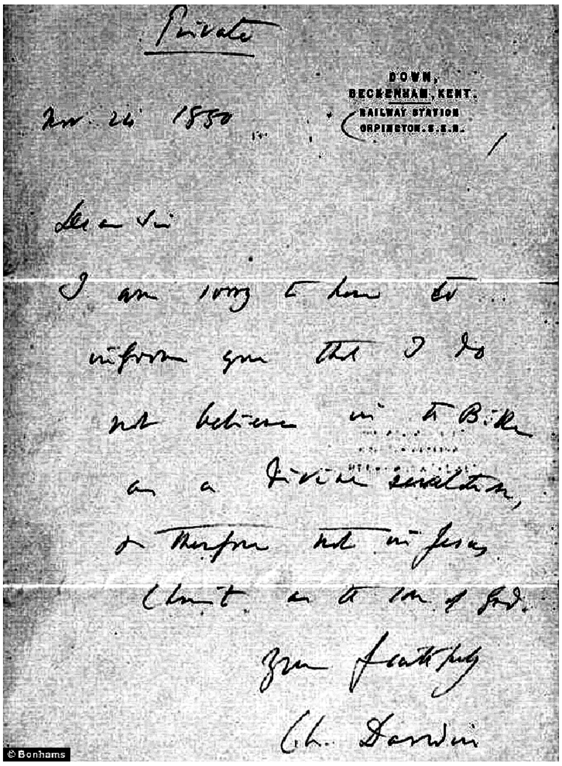

Private

DOWN,
BECKENHAM, KENT.
RAILWAY STATION
ORPINGTON. S.E.R.

Nov. 24 1880

Dear Sir

Yours faithfully

Ch. Darwin

© Bonhams

বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২) বিবর্তনবাদের জন্ম দিয়েছিলেন এবং তাঁর জীব বিবর্তনবাদ প্রাণের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বহুকাল ধরে চলে আসা দার্শনিকদের বিতর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বাইবেল, উপনিষদ, কোরাণ সহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে জীবের সৃষ্টি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেয় এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। তাঁর রচিত 'অরিজিন অফ স্পিসিস বাই ন্যাচারাল সিলেকশন' বিজ্ঞানের জয়যাত্রার একটা মাইলস্টোন।

তিনি মনে করতেন ঈশ্বরতত্ত্বকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানালে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া যথেষ্ট দূরুহ কাজ হবে। জিওর্দানো ব্রুনো বা গ্যালিলিও'র অভিজ্ঞতা তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি যে ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না, নাস্তিক ছিলেন এই প্রশ্নে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেন নি। ১৮৮০ সালে ২৩শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যুর দুই বছর আগে ফ্রান্সিস ম্যাকডারমট নামে এক তরুণ ব্যারিস্টার ডারউইনকে এক চিঠিতে লেখেন, "আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার লেখা পড়ার পর 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এ আমার বিশ্বাস চলে যাবে না তো? সোজাসুজি 'হ্যাঁ' বা 'না'য় আমাকে বলুন, আপনি 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এ বিশ্বাস করেন কি না?"

পরদিনই অর্থাৎ ২৪শে নভেম্বর ১৮৮০ ডারউইন সৌজন্যরক্ষার জন্য ম্যাকডারমটকে এক ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁর উত্তর দেন। তিনি তাঁর জবাবে লেখেন, "মহাশয়, আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি বাইবেল মানি না এবং যিশুখ্রিস্টকে ঈশ্বরপুত্র বলে স্বীকার করি না, ইতি ...."

ব্যারিস্টার ম্যাকডারমট এরপর ডারউইনকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি এই চিঠি কখনও প্রকাশ্যে আনবেন না। পরবর্তী ১০০ বছরে এই চিঠির কোনো হদিশ মেলে নি। তারপর এই চিঠিটি নিউ ইয়র্কের একটি নিলামে ২ লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়।

এই বিখ্যাত চিঠিটি লেখার একমাস আগে ডারউইন তাঁর বন্ধু এবং বিশিষ্ট নিরীশ্বরবাদী এডোয়ার্ড অ্যাভেলিং-কে লেখেন "আমি সব সময় ধর্ম নিয়ে লেখা এড়িয়ে চলি। আমার বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকাই ভালো।" ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com